গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

বাংলা সাহিত্যের একজন অনবদ্য কবি, নাট্যকার এবং সঙ্গীতস্রষ্টা হলেন কবি শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯ জুলাই ১৮৬৩ – ১৭ মে ১৯১৩)। তিনি যেমন 'কাব্য প্রত্যয়ে ও কাব্যরীতির অভিনবত্বে' বিশিষ্ট মনন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, তেমনি তাঁর নাট্যকর্মে সমসাময়িক জাতীয় ভাবধারার প্রতিফলন লক্ষ্যনীয়। যুগজীবনের চিত্রকে তিনি সঙ্গীতের মর্মে মর্মে গ্রন্থিত করেছেন, তাঁর সৃষ্ট সেই গীতরাজি আজও ধ্বনিত হয় মুক্ত এই ধরাতলে "সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি..."

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ২
জুলাই ২০২০

কলম হাতে

পত্রালিকা বিশ্বাস, অনির্বাণ বিশ্বাস, ইন্দ্রানী বসু, নাহার আলম, ডাঃ অমিত চৌধুরী, শামসুদ্দিন শিশির, জালাল উদ্দিন লস্কর শাহীন, সিদ্ধার্থ বসু, মালা মুখার্জী, এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

সাহিত্যকে বলা হয় জীবনের প্রতিফলন কিংবা জীবনের এক টুকরো প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যের ভাষা বিভিন্ন জায়াগায় বিভিন্ন রকম হোক না কেন, এর সৃষ্টি-কর্মের বিষয় বা ধাঁচটা প্রায় সর্বত্রই একই রকম। অর্থাৎ মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক বা আধ্মাত্মিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই সর্বত্র আবর্তিত হয় সাহিত্য। সাহিত্য হল এমন এক ক্ষুরধার অস্ত্র, যার ক্ষুরের ধার বাহ্যিক রক্তক্ষরণ না ঘটালেও, অনাদিকাল থেকেই মানুষকে নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত ও সত্যের-সুন্দর প্রতিষ্ঠানে উদ্দীপিত করে আসছে।

বর্তমানে সারা বিশ্ব এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। মারণ ভাইসারের কবলে পড়ে বিশ্বের সকল মানুষই অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারমধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, দলাদলি ও স্বার্থান্বেষী মনোভাব জীবনে চলার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও উন্নত পরিকাঠামোর অভাব, সমবন্টনের অভাব, মধ্যমণিদের লোভের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে লাভের হার বাড়ছে, অন্যদিকেও হার বাড়ছে, তবে তা প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার। মানুষ ভুলেই গিয়েছে, "দশে মিলে করি কাজ/ হারি জিতি নাহি লাজ। ■

বিনীতা –

রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

কলম হাতে

কলম হাতে

মুল প্রচ্ছদ চিত্রঃ
Ana Madeleine
Uribe from Pexels

প্রার্থনাঃ
করোনা নির্মূল হোক
পৃথিবী শান্ত হোক

আনন্দ সংবাদ

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে **শ্রী অসিত চট্টোপাধ্যায়** মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত **'হাওড়া রসিক সভা'** সম্প্রতি **'গুঞ্জন'** পত্রিকার লেখালেখির পাতার সাথে এক যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। অসিতবাবু আমাদের সাথে আগে থেকেই সংযুক্ত আছেন। তাঁর লেখায় অনেকবারই সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের গুঞ্জনের পাতা। ঐ সভার সকল সদস্যদের জানাচ্ছি যে, **তাঁরা তাঁদের স্বরচিত লেখাগুলি, যা শুধুমাত্র হাওড়া রসিক সভাতেই প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের ই-মেলে** (contactpandulipi@gmail.com) **পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখাগুলি গুঞ্জনে প্রকাশিত হবে।**
বিনীত
প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

দ্বিতীয় পর্যায় (১)

"নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রদেহদ্বিনিঃস্রিতা,
তারয়েত সর্বভুতানি স্তাবরানি চরানি চ....।"

নর্মদা মায়ের আরতি এবং বন্দনা করে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিক্রমা শুরু করলাম সহস্রধারার সুন্দরচৌরির সচ্চিদানন্দ মহারাজের আশ্রম থেকে। গতকাল ২২/২/১৬ রাত বারোটার সময় এই আশ্রমে এসেছি, চার ঘণ্টা ট্রেন লেট ছিল।

জব্বলপুর থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরে মহারাজপুর। এখান থেকে অটো করে আট কিলোমিটার দূরে, সহস্রধারায় আসতে সুযোগ বুঝে পাঁচশো টাকা নিল অটোওয়ালা আর তার সাথে দুর্ব্যবহার ফ্রি। রাত বারোটায় এসে মাঘী পূর্ণিমার চাঁদের বাহার দেখার মত শরীরের অবস্থা নেই। নর্মদার জলে চাঁদের আলো পড়ে যে স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা বর্ণনাতীত কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে, "পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।" মহারাজ রাতের খাবার দিয়ে আমাদের শোবার জায়গা দেখিয়ে দিলেন। আগেই বলা ছিল, তাই ভোজন এবং আশ্রয় পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি।এখানে আসার আগে জেনে এসেছিলাম রাত্রে খুব ঠাণ্ডা নেই, কিন্তু এসে দেখলাম তার উল্টো।

নমামি দেবী নর্মদে

২৩/২/১৬ সকাল ছটায় হাঁটা শুরু করেছি সুন্দরচৌরি গ্রাম বা সহস্রধারা থেকে। প্রায় চার কিলোমিটার হাঁটার পরে একটি পাহাড়ের কোলে চন্দ্রকুরি গ্রামে এলাম। সামনেই পাহাড়, এই পাহাড় টপকাতে পারলে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা কম হাঁটতে হবে। দুঘণ্টার চেষ্টায় চড়াই উৎরাই পেরিয়ে নামলাম থোরা গ্রামে। গ্রামের মধ্যে হনুমান মন্দিরে কিছুক্ষন বিশ্রামের জন্য বসলাম। মন্দিরের থেকেই চায়ের ব্যবস্থা হল। দুপুরে ভোজন প্রসাদ নেওয়ার কথাও বলছিল। কিন্তু এখন মাত্র সকাল ১০টা, তাই অপেক্ষার প্রশ্ন নেই। আবার এগিয়ে চলা... তিন কিলোমিটার যাওয়ার পরে আরেকটি পাহাড় পেল্াম। আগেরটির থেকে এটি বেশ বড়। পিঠে ব্যাগ নিয়ে চার হাত-পা এক করে এগিয়ে চলেছি। জন্তু জানোয়ারের ভয় না থাকলেও সাপের ভয় আছে, আর আছে পা পিছলে পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ার ভয়। বহু কষ্টে নেমে এলাম সালহাডাণ্ডা গ্রামে। এখানে মান্দালা জেলা শেষ হয়ে সিউনি জেলা শুরু হল। কিন্তু আমাদের আজকে পাহাড়ে পেয়ে বসেছে। আবার পাহাড়, শরীরের ক্ষমতা শেষ। বিকেল তিনটের সময়েও এক দিকে জঙ্গল, অন্য দিকে পাহাড়, মাঝখানে কোন রকমে পায়ে হাঁটা পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। সকাল থেকে দু'কাপ চা ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি। বিকেল পাঁচটার সময় এলাম পাটন গ্রামে। মন্দিরে কৃষ্ণ কথা হচ্ছে। আমাদের চা এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা মন্দির কমিটি করে দিল। আজকের মত এখানেই বিশ্রাম।

নমামি দেবী নর্মদে

পাটন গ্রামে আমাদের আজ রাত্রিবাস। ধর্মশালায় আরও কিছু পরিক্রমাকারী ছিল, আমরাও তাদের মধ্যে। একটি ২০/২২ বছরের ছেলে কেন জানি না বারবার আমাদের কাছে এসে বসছে। শেষে অনুরোধ করলো, ওদের বাড়িতে রাত্রিবাসের জন্য। আমরাও রাজী হয়ে গেলাম। খুব ঠাণ্ডা পড়ছে, ওদের বাড়িতে গিয়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে পড়লাম। খুব ক্লান্ত, আমার হিসেবে আজ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেছে।

আজ বুধবার ২৪ তারিখ, খুব ভোরে উঠে প্রাথমিক কাজ সেরে বেড়িয়ে পড়লাম। সকাল পৌনে ছ'টা, সূর্য দেবের তখনও দেখা নেই, আমরা এগিয়ে চলেছি। গ্রামটি ছোট হলেও বর্ধিষ্ণু। ডিস এন্টেনা, মোটর বাইক, গরু, মোষ প্রত্যেকের বাড়িতেই দেখলাম। যাক, কালকের রাতটা আমাদের ভালই কাটল, আজ আবার নতুন সকাল।

"নতুন সূর্য আলো দাও আলো দাও।" কালকের কোন কষ্ট আজ আর নেই। তিনজনে এগিয়ে চলেছি, পরিক্রমার গল্প, মা নর্মদার গল্প করতে করতে। রাস্তার দুই পাশে চাষের ক্ষেত, আধুনিক ব্যবস্থায় চাষ হচ্ছে। ফলন ভালই হয়েছে। দুই পাশে সেই ভাবে কোন ঘর বাড়ি নেই। সকাল থেকে প্রায় চারকিলোমিটার আমাদের হাঁটা হয়ে গেল। পেছন থেকে এক বৃদ্ধা আমাদের ডেকে চা খাওয়ালেন। ছোট দোকান থেকে একটি ছেলে তিন প্যাকেট বিস্কুট দিল। আমরা বাচ্চাদের মধ্যে সেই বিস্কুটটা ভাগ করে দিলাম। ওই সরল নিষ্পাপ মুখগুলোতে হাসি দেখে

খুব ভাল লাগলো। মনে হল আমাদের এই বারের পরিক্রমাও সফল হবে।

‘নর্মদে হর’ বলে আবার এগিয়ে চললাম। এবারে যে গ্রামটিতে এলাম তার নাম বেরিলি। মেয়ে পুরুষ সবাই এক সাথে মাঠে কাজ করছে। হঠাৎ দেখি বাইকে করে আগের রাত্রে আমাদের আশ্রয়দাতা ছেলেটি এসে হাজির। দশ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছে। সকালে যখন আমরা আসি তখন ও ঘুমিয়ে ছিল, ওদের এই সরল আচরণ মন ছুঁয়ে গেল। কুশল বিনিময় করে ওকে বিদায় দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম।

নর্মদে হর। ■

শুনুন শিল্পীর কণ্ঠে আরও কিছু সুন্দর গান

https://www.youtube.com/watch?v=mp0Ig1UCHbk&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=0st25lIB7rQ

https://www.youtube.com/watch?v=H_Oi5hUbCj0

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

অন্য পৃথিবীর পদ্ম বাগান

স্বাগতা পাঠক

সব কিছুর শেষেও কেমন যেন একটা কিন্তু থেকে যায় আর আমি বা আমরা কেউই সেটাকে মেলাতে পারি না। বিচিত্র এই পৃথিবী আর তার থেকেও বেশি বিচিত্রময় আমাদের এই প্রকৃতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোণায় কোণায় অদ্ভুত সব সৃষ্টি লুকিয়ে রেখেছে। যেগুলো প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে গুলোর প্রতিটির নিজ নিজ শক্তি ও গুণাবলী আছে। জীবিত সব কিছুই নিজের অস্তিত্ব বোঝানোর জন্য কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া করেই চলেছে প্রতিনিয়ত।

ফুলগুলো পুড়িয়ে ফেলার সময় কেউ একবারের জন্য খেয়াল করেনি ফুলগুলির বৃন্ত থেকে সমস্ত কাঁটা ঝড়ে পরেছিল এই ফুলদানির ভেতরে। জলের অভাবে সেগুলো এত দিন শুকিয়ে ছিলো এই চিনা মাটির ফুলদানীর মধ্যেই। অযত্নে ছাদের কোণায় পরে থাকা এই ফুলদানী এতদিন কারো চোখে পরেনি, জলের অভাবে কাঁটাগুলো প্রাণহীন ছিল কিন্তু বর্ষার জল পাওয়ার পর থেকেই সেইগুলো আবার তরতাজা হয়ে বড় হতে শুরু করেছে। একটা দুটো নয় প্রায় শ-খানেক কাঁটা থেকে অঙ্কুর বেরোতে শুরু করেছে। এই

ফুলগুলির মধ্যে এমন অদ্ভুত এক জীবন শক্তি আছে সেটার প্রমাণ আগেও পাওয়া গেছে। বংশ বিস্তার করার জন্য এই ফুলের একটা কাঁটাই যথেষ্ঠ।

কাউকে কিছু না জানিয়ে শ্রাবন্তী ফুল সমেত ফুলদানিটা সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখল ছাদের অন্য কোণায়। এই বৃষ্টিতে ছাদে কেউই আসবে না, তাই কারো চোখে পরার কোনো সুযোগ নেই। আগামীকাল এইগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে বলে সে ঠিক করল।

অনেক চেষ্টা করেও শ্রাবন্তী নীলাদ্রিকে কিছু বলতে পারলো না। কারণ সে জানে এটা জানার পর নীলাদ্রি এই গুলোকে আবার পুড়িয়ে ফেলার কথাই বলবে। কিন্তু মনের গভীর থেকে কোথাও যেন একটা অন্য রকম টান অনুভব করছিল শ্রাবন্তী। সে কিছুতেই ফুলগুলোর থেকে নিজেকে আলদা করতে পারছিল না।

শ্রাবন্তীর ছাদে গাছ লাগানোর বেশ অভ্যাস আছে। তাই সিমেন্টের বড় বড় বেশ কয়েকটা টব বানানো আছে ছাদে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে মাটি ভর্তি। পরদিন সকাল থেকেই শ্রাবন্তী ছাদে গাছের টবগুলো থেকে মাটি সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু করলো। বৃষ্টির যা গতি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এই গুলোর মধ্যে জল জমে যাবে। টবগুলোতে জল জমিয়ে, জল বেরোনোর মুখগুলো সে আঁটকে দিল। আর এখন বর্ষাকাল বৃষ্টি হবেই তাই জলের অভাব ঘটবে না। এরপর সে ভাঙা

কল্প বিজ্ঞান

চিনা মাটির ফুলদানিটা ডুবিয়ে দিল ওই একটা জলে ভরা টবের মধ্যে। প্রতিদিন সকালবেলা একবার এসে সে দেখে যায় ফুলগুলোকে। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই ফুলগুলো বেশ তরতরিয়ে বড় হয়ে গেলো। শ্রাবন্তীর মনে হলো সব কিছু যেন আগের মতো ঠিক হয়ে গেছে। এর মধ্যে একদিন নীলাদ্রি একটা খবর জানালো,

— খবরের কাগজটা পড়েছ?

— কেন বলতো?

— রাজর্ষির একটা খবর ছেপেছে।

— রাজাদার খবর!

— হ্যাঁ গো, আর শুনলাম রাজার বাবা পরশু জাপান যাচ্ছে।

— কিন্তু কেন? আর খবরটাই বা কি?

— খবরে লিখেছে, কলকাতা নিবাসী একজন বাঙালি বৈজ্ঞানিক। জপানের এক বিখ্যাত মেডিক্যাল কোম্পানির জন্য একটা বিশেষ ধরনের ওষুধ তৈরি করতে গিয়ে দারুন ভাবে ব্যর্থ হন। যার এমন ভয়াভয় ফল হবে তা কেউ ধারণা করতে পারেনি। ওই বাঙালি বিজ্ঞানী তাঁর তৈরী ওষুধের প্রথম প্রয়োগ নিজের উপরেই করেন। আর সেটার প্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, এখন তাঁকে জাপানের একটা মেন্টাল আসাইল্যামে ভর্তি রাখা হয়েছে।

— বলো কি?

— তবে আর বলছি কি তোমায়!! খবরের কাগজ থেকে সে ভাবে কিছু জানা যায়নি। তাই জাপানে আমার একা ডাক্তার বন্ধুর মামার সাথে যোগাযোগ করে যা জানতে পারি তাতে আমার আমার পায়ের নীচের মাটি সরে যায়।

— কেন কি শুনলে?

— পিকুল যা হয় ভালোর জন্য হয়। ভাগ্যিস আমরা সেদিন ওই ফুলগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলাম।

— কেন কি হয়েছে সেটা আমাকে বলো?

— শুনলাম, ওই ওষুধ প্রয়োগ করার পর হঠাৎ করেই রাজা জ্ঞান হারায়। যখন ওর জ্ঞান আসে। তখন ওর চোখ রঙের বদলে সম্পূর্ণ সবুজ হয়ে গিয়েছিল। আর ও খুব হিংস্র হয়ে উঠেছিল আসে পাশের সকলের উপর আক্রমণ করছিল। একটা সময় ওর শরীরের সমস্ত শিরা ফুলে ওঠেছিল এবং নিজের শরীর নিজেই আঁচরে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে শুরু করেছিল। কোন ভাবেই ওকে সামলানো দায় হয়ে পরে, শেষসমেষ ওকে মেন্টাল অস্যাইলামে দেওয়া হয়। ওর ব্লাড স্যাম্পেল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয় ওর শরীরে ডিএনএ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওর শরীরের বিভিন্ন অংশ বিশ্রী রকম ভাবে বেড়ে যেতে শুরু করে, আর সেটা তৎক্ষণাৎ কেটে বাদ দিতে হয়। আর দেখা যায় – ওর শরীর থেকে রক্তের বদলে একটা সবুজ চ্যাট চ্যাটে তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে। কিন্তু সব থেকে

আশ্চর্যজনক ব্যাপার – সেটার থেকে একটা সুন্দর গন্ধ ছড়িয়ে পরছে বাতাসে যেটা ঠিক একটা নেশার মতো কাজ করছে আশপাশের মানুষজনের উপর।

এখন ওর শরীর নিয়ে গবেষণা চলছে জাপানে। বর্তমানে ওর চেহারার যা বিবর্তন ঘটেছে সেটা মিডিয়ার সামনে আনা দায়।

শ্রাবন্তী এক মনে সমস্ত কথাগুলো শুনে গেল। ওর বুকের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্ক ধরা দিল।

— এই পিকলু তুমি কি ভাবছো বলতো?

শ্রাবন্তী একটু অন্যমনস্ক ছিল। নীলাদ্রির ডাকে সে সম্বিত ফিরে পেল।

— হ্যাঁ বলো।

— কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে?

— না কিছু না।

আজ আঠেরো দিন কেটে গেছে। শ্রাবন্তীর ছাদ বাগানে এখন নানা রঙের পদ্মফুলের মেলা। এতো সুন্দর ফুলগুলো দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। কিন্তু রাজাদার খবরটা পাওয়ার পর থেকেই, এই ফুলগুলোকে দেখলেই শ্রাবন্তীর মনে একটা বিষন্নতা ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর মনে এখন একটাই প্রশ্ন, সে আবার এই ফুলগুলোকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে ভুল করেনি তো! আর বিশেষ করে সমস্ত ব্যাপারটা সে নীলাদ্রির

কাছে লুকিয়ে গেছে। ফুলগুলোর উপর হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখছিল শ্রাবন্তী। এর মধ্যে সে হঠাৎ তার বাঁ হাতের তর্জনীর মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলো, সাথে সাথেই হাত সরিয়ে নিয়ে দেখল, আঙ্গুলের মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। হঠাৎ করেই শ্রাবন্তীর চোখে পড়ল, লাল রঙের একটা পদ্ম ফুলের বৃন্তের একটা কাঁটাতে রক্ত লেগে, ওই কাঁটাটাই ওর আঙ্গুলে ফুটেছে সেটা বুঝতে আর বাকি থাকলো না। কিন্তু একি দেখছে শ্রাবন্তী! পদ্মফুলের কাঁটাগুলো সাধারণের থেকে মাত্রায় অনেকটা বড়। প্রায় এক ইঞ্চি কোনটা আবার দুই ইঞ্চি। শ্রাবন্তীর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

ছাদে শ্রাবন্তী ছাড়া বাড়ির কেউ আসে না। এ বাড়িটা একটু ভিন্ন ধরনের। মাঝখানের চিলে কোঠার ঘরে দুই দিকে দরজা আর ছাদটাও দুই ভাগ ভাগ করা ওদের দুটো ছাদ। একটাতে বাড়ির জামা কাপড় মেলার জন্য ব্যবহার করা হয় আর অন্যটায় গাছপালা আর বাড়ির অব্যবহৃত ভাঙা জিনিসপত্র রাখা থাকে।

শ্রাবন্তী ওই ছাদের গেটে তালা দিয়ে নীচে নেমে এল। কোনো রকমে হাতে একটা মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে অফিসে বেরিয়ে গেল সে।

সেদিন সারাদিন ঠিক করে কাজ করতে পারেনি শ্রাবন্তী। একটা ক্লান্তি ওর শরীরকে অবসন্ন করে রেখেছে। নার্সিং

হোমে এসে থেকেই কেমন দুর্বল লাগছে ওর। ব্লাড প্রেসার চেক করেও দেখেছে, সব নর্মাল।

মনের মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কা, সকালে যে আঙ্গুলে পদ্ম ফুলের কাঁটা ফুটল, তার জন্য কিছু হয়নি তো? কাজ সেরে চেঞ্জ করতে এসে শ্রাবন্তী দেখলো সকালে হাতের ব্যান্ডেটটা খোলা হয়নি। ফ্রেশ হয়ে এসে, জামা কাপড় চেঞ্জ করে একটা নতুন ব্যান্ডেট নিয়ে সে পুরনো ব্যান্ডেটটা খুলতেই চমকে গেল। আঙ্গুলের মাথায় ক্ষত স্থানটা লাল হয়ে গেছে। ঠিক যেন কোনো বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে যেমন হয়। অন্য হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই মারাত্মক যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠল। সারাদিনের কাজের মাঝে কিছু অনুভব করেনি। এখন সে কি করবে বুঝে উঠতে পারল না।

নীলাদ্রিকে ফোন করাটাও ঠিক হবে না কারণ আজ ও পর পর অনেকগুলো ওটি করবে। প্রতিদিন ফেরার পথে সে নীলাদ্রির সাথে দেখা করে ফেরে। চেঞ্জিং রুম থেকে বেরোনোর মুখেই নীলাদ্রির সাথে দেখা হল। শ্রাবন্তীর মুখে চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে।

— বাড়ি ফিরছো?

— হ্যাঁ, এই তোমার সাথেই দেখা করতে যাচ্ছিলাম।

— কি হয়েছে? তোমাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

— না কিছু না।

হঠাৎ নীলাদ্রি শ্রাবন্তীর বাঁ কানের পাশে দেখিয়ে বলল,

এইখানে এমন লাল হয়ে আছে কেন?

শ্রাবন্তী কানের পাশে হাত দিতেই অনুভব করলো সেখানেও তীব্র ব্যথা। নিজের অজান্তেই শ্রাবন্তীর মুখ থেকে, যন্ত্রণা কাতর একটা শব্দ বেরিয়ে এল। নীলাদ্রি বলল, “এক মিনিট হাত দিও না। আমার সাথে চলো।” নীলাদ্রি খুব ভালো করে শ্রাবন্তীর কানের পাশে পরীক্ষা করতে লাগলো।

— মনে হচ্ছে কোনো বিষাক্ত কিছুর কামড় থেকে হয়েছে। আচ্ছা তুমি কিছু টের পাওনি?

শ্রাবন্তীর কাছে এখন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার। তার আর বুঝতে বাকি নেই এইগুলো কিসের থেকে হয়েছে। এই মুহূর্তে নীলাদ্রির কাছে কোনো কিছু লুকিয়ে লাভ হবে না শ্রাবন্তী সেটা ভালো করেই বুঝে গেছে। বাঁ হাতের তর্জনীটা দেখিয়ে শ্রাবন্তী বলল, “আজ সকালে পদ্ম ফুলের কাঁটা ফুটে আমার এই অবস্থা। তুমি দেখলে কানের পাশে কিন্তু আর শরীরের কোথায় কোথায় এমন হয়েছে আমি জানিনা।

— পদ্ম ফুল !

— হ্যাঁ।

শ্রাবন্তী তারপর সমস্ত ঘটনাই নীলাদ্রিকে খুলে বলল।

— মানে তুমি কি পাগল হলে! তুমি আমাকে না জানিয়ে আজ এতো দিন ধরে ওই ফুলগুলোকে ছাদ বাগানে বড় করছো?

— এখন কি হবে আমার খুব ভয় করছে নিল।

— ঠিক আছে আগে চেঞ্জিং রুমে গিয়ে দেখো শরীরের আর কোথায় কোথায় বিষক্রিয়া ছড়িয়েছে। পিঠের ডান দিকে, বাঁ কাধ, দুই উরুতে, বুকের উপর। শরীরের আরও বিভিন্ন জায়গায় বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

নীলাদ্রি সাথে সাথে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন শ্রাবন্তীকে দিল এবং সেই মুহূর্তে তাকে নিয়ে রওনা দিল সিনিওর ডাক্তার দেবারুন ব্যানার্জির বাড়ি চেতলা। জাপানের রাজর্ষির কেসটার ডিটেলস উনি জানতেন। বাকি সমস্ত কিছু নীলাদ্রি দেবারুণবাবুকে বললেন। সব কিছু শোনার পর কিছু কড়া ডোজের ইনজেকশন আর ওষুধ রেফার করে উনি বললেন, “শোনো এই মুহূর্ত থেকে শ্রাবন্তীকে কোনো একটা ঘরে সকলের থেকে আলাদা করে রাখতে হবে। শুধু মাত্র তুমি ওর ঔষুধ আর খাবার দাবার দেবে। বাইরের আর কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। জাপানের ঘটনা এখন সারা বিশ্বে ব্যাপক ভাবে সাড়া ফেলেছে। আর মিডিয়া বা অন্য কেউ যদি জানতে পারে এর উৎস তোমরা, তবে অন্য রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। আমার কিছু ঘনিষ্ঠ মানুষ আছেন, যাঁরা পুলিশি ব্যবস্থাটা সামলে নেবে। আমরা পরশু দিন শ্রাবন্তীর বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ফুলগুলো নষ্ট করে দেব। সঠিক প্রটেকশন নিয়ে যেতে হবে আমাদের। এর মধ্যে কেউ ভুলেও ওই ছাদে যাবে না।”

সেই রাতে শ্রাবন্তীকে বাড়িতে নিয়ে গেল নীলাদ্রি। শ্রাবন্তীর মা আর দাদা বৌদিকে সমস্ত কিছু জানাল সে, আর নীলাদ্রি যে কদিন শ্রাবন্তীর বাড়িতেই থাকবে সেটাও সে জানাল।

শ্রাবন্তীর মা কান্নাকাটি করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নীলাদ্রি তাঁকে শান্তনা দিয়ে বলল, "কিছু হবে না মাসিমা ওর, আমি আছি তো।" একটা আলাদা ঘরে শ্রাবন্তীর থাকার ব্যবস্থা করা হল। তাকে খাবার খাইয়ে সমস্ত ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে নীলাদ্রি ঘরের বাইরে এল। হ্যাঁ বাইরে থেকেও সে লক করে দিল দরজাটা। ডাক্তার ব্যানার্জি, বাড়ি ফেরার সময় নীলাদ্রিকে আলাদা করে ডেকে বলে দিয়েছিলেন শ্রাবন্তীকে ঘরে লক করে রাখতে। একটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল নীলাদ্রির গাল বেয়ে। হ্যাঁ সে ডাক্তার বাস্তব সত্যিটা তাকে মেনে নিতেই হবে। শ্রাবন্তী নিজেও হয়তো বুঝতে পেরেছে কি হতে চলেছে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি নীলাদ্রি। কারণ তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর ইনজেকশনটা দিতে হবে। রাত দুটো...

— পিকলু?

— হুমম

— ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

— হ্যাঁ ওই চোখটা একটু লেগে এসেছিলো।

— ইনজেকশনের সময় হয়েছে।

শ্রাবন্তীর মুখটা দেখে নীলাদ্রির বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল। মুখের ৭০% অংশে লাল রং ছড়িয়ে গেছে, নিজের চোখের জল সামলে সে ইনজেকশনটা দিল। শ্রাবন্তী নীলাদ্রির হাতের উপর হাত রেখে বলল, "পরজন্ম বলে কোনো কিছু আছে নীল?"

— আমার জানা নেই পিকলু।

— যদি থাকে, তবে পরেরবার আমি কথা দিলাম শুধু তোমার হব।

নীলাদ্রির চোখ ছল ছল করে উঠল। শ্রাবন্তীকে বুকে জড়িয়ে ধরল সে।

— নীল আমার যন্ত্রণা হচ্ছে।

হ্যাঁ সামান্যতম স্পর্শ শ্রাবন্তীর শরীরে কাঁটার মতো বিঁধছে।

— সরি পিকলু, বলে নীলাদ্রি উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল।

পরদিন সকালবেলা, শ্রাবন্তী নিজের চেহারাটা শেষ বারের মতো আয়নায় দেখল, সমস্ত শরীর লালচে। চোখের মণিগুলো অবধি লাল রং ধারণ করেছে। প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর একটা করে হাই পাওয়ার ব্যথার ইনজেকশন শ্রাবন্তীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নীলাদ্রি ছাড়া আর কারো যাওয়ার অনুমতি নেই ওর কাছে। সকলেই দুর থেকেই দেখতে পারবে। শ্রাবন্তীর দাদা জানেন তাঁর বোনের শেষ পরিণতি। শুধু মাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কল্প বিজ্ঞান

পরদিন রাত ন'টা নাগাদ তিনজন লোকের সাথে ডক্টর ব্যানার্জি এলেন শ্রাবন্তীর বাড়িতে। ছাদ বাগানে ফুলগুলো যেন তখন আরও বেশি সতেজ হয়ে উঠেছে বাকি তিনজন লোক সুরক্ষার পোশাক পড়ে নিয়েছে। হাতে রয়েছে কাটারী আর কিছু জরুরী জিনিস। দরজা খুলে সামনে যেতেই হলুদ রঙের একটা ফুলের বৃন্ত সাপের মতো পেঁচিয়ে যেন ছুটে এসে পরলো একজনের গায়ের উপর তাঁর পোশাক ছিঁড়ে গেলো বেশ কিছুটা। সাথে সাথে তাঁকে বাইরে এনে পরীক্ষা করা হলো, শরীরে কোথাও ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে কিনা। সৌভাগ্যক্রমে কোনো ক্ষত হয়নি।

আবার সেই মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে সারা বাড়ি জুড়ে। হ্যাঁ অবিশ্বাস্য ভাবে ফুলগুলো টের পেয়েছে তাদের বিপদ। কিন্তু এখন এই ফুলগুলো আগের মতো নেই, আগের থেকে আরও বেশী বিপদজনক এবং কেমন যেন আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। কোনোভাবেই সামনে যাওয়া সুরক্ষিত নয়। সুরক্ষা বস্ত্রও একটা সময়ের পর আর টিকবে না। আর ঐখানে এখন প্রায় শ-খানেক ফুল।

নীলাদ্রি একবার চিলেকোঠার জানলার ফাঁক থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল। সত্যি ঠিক যেন বিষাক্ত সাপের মত ফণা তুলে দুলছে ফুলগুলো রাত পেরোলেই এইগুলো আগুন ধরিয়ে পোড়ানো মুশকিল। লোকের চোখে পরবে কিন্তু এখন কিই-বা করা যায়! অনেক ভেবে ডাক্তার

ব্যানার্জি শ্রাবন্তীর কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, "দেখো শ্রাবন্তী এখন আমাদের কাছে একটাই রাস্তা আছে।"

শ্রাবন্তী একবার ডাঃ ব্যানার্জির চোখে চোখ রেখে বলল, "হ্যাঁ স্যার আমিও সেটাই ভাবছিলাম।" তারপর একটা সুরক্ষা বস্ত্র পরে নিলো সে। এর মধ্যে ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "নীলাদ্রি ওকে একটা ইনজেকশন দিয়ে দাও।"
— কিন্তু স্যার এখনও তিন ঘণ্টা পার হয় নি।

ডাক্তার ব্যানার্জি নীলাদ্রির কাঁধে হাত রেখে বললেন, প্রয়োজন আছে। ইনজেকশনটা দিতে গিয়ে নীলাদ্রির নিজের কান্না আটকাতে পারলো না। শেষ বারের মত একবার শ্রাবন্তীকে জড়িয়ে ধরল। না আর ব্যথা পায়নি পিকলু।

হাতে একটা ধারালো ছুঁড়ি, নিয়ে সে ঢুকলো ছাদ বাগানে। ফুলগুলোর কাছে যেতেই দুটো ফুল এসে যেন শ্রাবন্তীর কাঁধে আর পিঠে একটা ঝাপটা মারল। পোশাকটা কিছুটা ছিঁড়ে গেল। শ্রাবন্তী দুই হাতে একটা একটা করে কেঁটে ফেলতে লাগলো ফুলগুলোকে আর তার সাথেই একটার পর একটা আঘাত পড়তে থাকে শ্রাবন্তীর হাতে পিঠে, গলায়। এখন পোশাক ভেদ করে কাঁটার আঁচড় গিয়ে লাগছে ওর শরীরে। টুকরো টুকরো করে কেটে সব ফুলগুলোকে জড়ো করে রাখলো ওই সিমেন্টের টবের মধ্যে। তারপর বাকি দুইজন লোক, দুই ড্রাম পেট্রোল নিয়ে ছিটিয়ে দিল ওই কেটে রাখা ফুলগুলোর উপর। ফুলের গন্ধে

তখন সকলের মাথা ঝিম ঝিম করছে। একটা দেশলাই ঠুকে দিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে গেল সমস্ত ফুলগুলো আর সাথে সাথেই সেই কান ফাটা শব্দ। মাঝ রাতের অন্ধকারে চিরতরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল অন্য পৃথিবীর বিষাক্ত অভিশাপ।

ঘড়ির কাঁটায় রাত তখন ৩ টে বেজে ৩৩ মিনিট। ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "শ্রাবন্তী, তুমিও তো জানো যে তোমার কাছে এখন তোমার জীবন একটা অভিশাপ। বাইরে খবর গেলে, তোমার শরীর নিয়ে রিসার্চ চলবে। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। তোমার ডিএনএ এর পরিবর্তন প্রতিনিয়ত পরীক্ষা হবে। তোমার শরীরের যন্ত্রণাতে তাদের কিছু আসবে যাবে না। আমরা গাড়িতে আছি। তুমি...

— হ্যাঁ স্যার। আপনরা অপেক্ষা করুন আমি আসছি।

শ্রাবন্তী, দাদা বৌদিকে শেষ বিদায় জানিয়ে, মায়ের কাছে গিয়ে হাত ধরে বলল, "আসি মা, তুমি দুঃখ পেও না।" আমি পরের জন্মে তোমার কোল আলো করে আবার ফিরে আসব। এর থেকে বেশী আর কি ভাবে মাকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় শ্রাবন্তীর জানা ছিল না।

নীলাদ্রির হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শ্রাবন্তী। অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ডক্টর ব্যানার্জি বসে ছিলেন। তাঁর সামনে ছিল একটা ইনজেকশন। এটাই হলো শ্রাবন্তীর জীবনের শেষ ইনজেকশন, এরপর তার সমস্ত ব্যথা দুর হয়ে যাবে চিরতরে।

জীবনের শেষ ইনজেকশন, এরপর তার সমস্ত ব্যথা দুর হয়ে যাবে চিরতরে।

— আমি চাই আমাকে এই ইনজেকশনটা নীল দিক।

শ্রাবন্তী নিলাদ্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল। ওষুধটা শিরা ধমনীতে ছড়িয়ে পরার সাথে সাথেই, নীলাদ্রির কোলে শ্রাবন্তীর অসার শরীরটা ঢলে পড়ল, আর আশ্চর্য রকমভাবে শ্রাবন্তী শরীরের লাল রংটা বদলে স্বাভাবিক হয়ে গেল। এই বিষাক্ত ভাইরাস শুধু মাত্র জীবিত শরীরের মধ্যেই বেঁচে থাকে – মৃত শরীরে এর অস্তিত্ব শূন্য।

সকাল ছটা। শ্রাবন্তীর শরীরটা এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। চিতার থেকে হাল্কা আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে। কিছু দূরেই বসেছিল নীলাদ্রি। চোখদুটো তার রক্তের মতো লাল। আকাশের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "জীবনের এই কঠিন সত্যিটা আমি মেনে নিতে পারছি না পিকলু। একবার বলে যাও আমি তোমাকে এখন কোন পৃথিবীতে খুঁজবো..."

...সমাপ্ত ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।
আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com
২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।
৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।
৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।
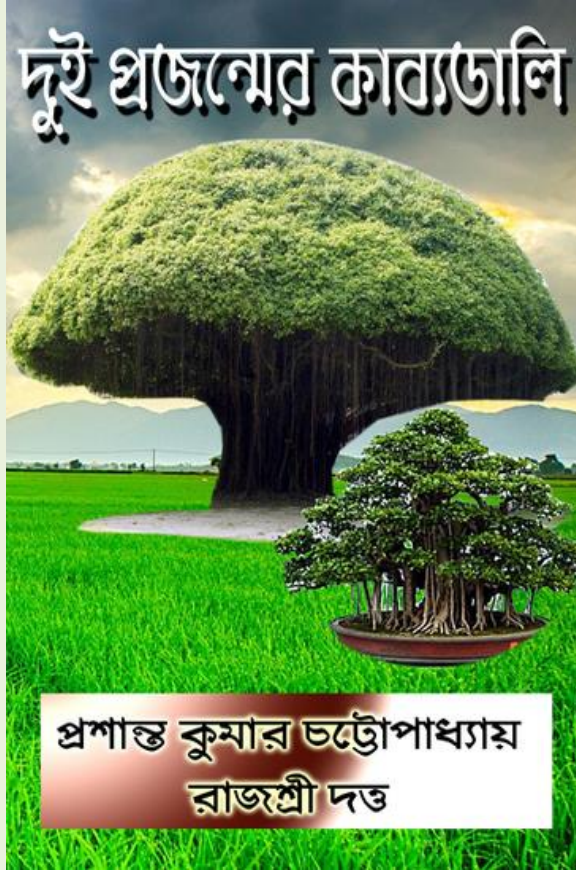
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

আহুতি

সিদ্ধার্থ বসু

ঝর্ণাপাড়ের সুখময় ইতিবৃত্ত,
লেখা আছে অশনির কালীমায়।
সাঁঝ বেলার পিদিম তলে,
আঁধারের সুখ স্মৃতি পিচ্ছিল বড্ড বর্ণময়।

মন উজানে ছলকে ওঠে মাস্তুলহীন ইহকাল,
নিয়ন আলোর স্তম্ভ জুড়ে স্তব্ধতার কোলাহল।
গ্রাম্য আলে ভাটিয়ালি সুর,
একতারা নিয়ে বড়ই সুমধুর।

আকাশে তখন সাদা মেঘের সারি,
প্রেক্ষাপটে আশমানী নীল, সম্মুখে কুয়াশার লুকোচুরি,
ঝিল্লি রব, অরণ্যে পাখির কলতান
মনের গভীর অলিন্দে রডড্রেনডন।

উপল মুখরিত নদী বহিছে কল্লোলিত সুরে,
মাছরাঙ্গা দল উচ্ছল হরষে নদী তীরে,
জোনাকিরা ঝিকমিকে সান্ধ্য পর্বত উরষে,
গভীর মুর্ছনায় মালকোষের সুর বরষে।

বৃষ্টিফোঁটা প্রেমহীন সৃষ্টিউল্লাসের ছোঁয়া,
হলোনা নীরার মতো কাব্যিক প্রেম পাওয়া।
অনিদ্রা চোখে না পাওয়ার আহুতি,
হৃদয় উপজে অনাদায়ী পূর্ণাহুতি।।

■

প্রবন্ধ

আসফাক উল্লার ভোর ও আলোর গল্পমালারা

দেবাশিস চক্রবর্তী

ওই মহা সিন্ধুর ওপার থেকে কোন সঙ্গীত ভেসে আসে... আর ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে বহু পথ ও মত ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা সঙ্গীতের মতই বার বার ভেসে এসেছে। এখন প্রশ্ন হল, ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের শুরুটা আমরা কবে থেকে ধরবো? আরও মজার প্রশ্ন হল বেদের যুগেও কী রাজনীতি ছিল না? সেই রাজনীতির ধারাও কী ভারতীয় ইতিহাসের ধারা নয়? ফলে প্রশ্নটা থেকেই যায়। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাগুলো কী কী? এবং তার সঙ্গে প্রাক আধুনিক ইতিহাসের সংযোগই বা কী? যাই হোক, বেদ দিয়ে যখন শুরু করেছি তখন বলেই ফেলি যে, সেই বেদের যুগেও যাগযজ্ঞ, ঈশ্বর ইত্যাদিকে চ্যালেঞ্জ করে চার্বাকদের জন্ম হয়েছিল। যারা মনে করতো পৃথিবীতে মানুষ একবারই আসে। কোনও পরজন্ম বলে কিছু হয় না। সুতরাং প্রতিটা মানুষকেই তার ইহজন্মেই সুখী হওয়া উচিত। আর এখান থেকেই মনে হয় ভারতীয় রাজনীতির ধারা গুলো সম্পর্কে একটা পরিস্কার ধারণা হয়তো পাওয়া যায়।

আর এই ধারণাই বলে যে, একদিকে যদি বেদ থাকে তাহলে অন্যদিকে তাকে চ্যালেঞ্জ করে আরও বেশি মাত্রায় মানব মুক্তির এক উন্নততর ধারণাও থাকবে। শুধু চার্বাকই নয় কপিলের দর্শনেও কোনও দৈব পুরুষ এই মহা পৃথিবী তৈরি করেছেন, এই থিওরি বাতিল হয়ে যায়। কপিলের সাফ কথা গতির নিজের নিয়মে এই মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে। এই মহা ব্রহ্মান্ড জুড়ে চলছে পুরুষ ও প্রকৃতির খেলা। অর্থাৎ আজ রাজনীতিতে যে বিষয়গুলো উঠে আসছে – পরিবেশ রক্ষা করা থেকে শুরু হয়ে ব্যক্তি মানুষের নিজেস্ব অধিকারগুলোকে আরও বেশি মাত্রায় সংগঠিত করা। তারই এক উপস্থাপনা সে যুগের সন্মান যেন দিচ্ছেন কপিল। বেদ যখন রাষ্ট্র যুদ্ধ এসব নিয়ে ভাবছে। সে সময়ই হয়তো কপিল চলে গিয়েছেন রাষ্ট্রহীন সমাজের এক কনসেপ্টএ, যেখানে রাষ্ট্র নয়, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে ভাবছেন কপিল। হয়তো রাষ্ট্রহীন এক সমাজের কথা ভাবছেন কপিল। তাই হয়তো পরবর্তী কালে আমরা দেখি গান্ধীজীর চিন্তায় রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজের কথা অনেক অনেক বেশি উঠে আসছে। স্বাধীনতার পর গান্ধী চাইছিলেন না যে কংগ্রেস দলটাই থাকুক, শক্তিশালী সেনা থাকুক, তার বদলে তিনি সমাজকে উন্নত করার ওপর গভীর দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি চাইতেন প্রতিটা আঁখি কোণ থেকে কান্না মুছিয়ে দিতে। ফলে সেই আবার যেন কপিলের সেই সুর ফিরে ফিরে আসছে। যা

হয়তো বলে আসল কথা শক্তিশালী রাষ্ট্র তৈরি করা নয়। আসল কথা হল সুন্দর জীবনকে ভাষা দেওয়া।

আবার খুব সংগত কারণেই গান্ধীবাদের আপোষমুখী বিষয়গুলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আম্বেদকার বা নেতাজীর ধারণায় স্টেট প্রবল গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু সে গুরুত্ব হল বাড়ির ভেতরে প্রবেশের জন্য দরজার যেমন গুরুত্ব থাকে ঠিক তেমনি। আমূল ভূমি সংস্কার সহ শ্রমিকদের জীবন জীবিকার উন্নতি আর জাতপাতের অবলুপ্তি। সেকুলার ভারতবর্ষ নির্মাণ। এই দাবিগুলো পুরণের জন্যই সুভাষ বোস বা আম্বেদকার এক নতুন ধরণের আধুনিক রাষ্ট্র চেয়েছিলেন। অর্থাৎ চার্বাকদের সময় থেকেই ভারতের ইন্টালিজেনসিয়া যে নতুন পথের সন্ধান করেছিল, তারই হয়তো এক তীব্র আধুনিক রূপ ছিল আম্বেদকার বা নেতাজীর রাজনীতি। সুতরাং ভারতীয় রাজনীতির এক তীব্র রূপ হল বধ্যাবস্থা নয়, বরং আরও আলো ও আধুনিকতার সন্ধানকে বাঙময় করে তোলা।

এই আলোর গল্পেকে হয়তো বোঝাই যাবে না। ভারতীয় কমিউনিস্টদের মাইনাস করে। নজরুল তাঁর ব্যথার দান উপন্যাসে দেখান কী ভাবে লাল ফৌজের হয়ে লড়তে চলে যায় বাঙ্গালী যুবকরা। ভিকাজি রুস্তম কামার মত বিপ্লবী চিৎকার করে বলেন, “নাও অল রোডস গোয়িং টুয়ার্ডস রাশিয়া।” ফলে এখান থেকেই মনে হয় বোঝা যায় যে রুশ

বিপ্লব কী গভীর ছায়াই না বিস্তার করেছিল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। আজকের অনেক তথাকথিত কমিউনিস্ট বলতেই ভুলে যান যে প্রথম স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল কংগ্রেস নয় ভারতীয় কমিউনিস্টরা।

তবে এই আলোর গল্পের ওপিঠে অন্ধকারও আছে। অবশ্য আলো থাকল অন্ধকারও থাকবে তা নিশ্চিত। সেদিন যদি নেতাজীর সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারতেন, তবে হয়তো দেশ ভাগ হত না। ভারতীয় উপমহাদেশের চেহারা আজকের মত হতো না। আর সেদিনও ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িক কারবারীরা মুসলিম লিগ ও তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্টিসিপেটই করেনি। ওই রাজনৈতিক ধারাগুলো ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে অনুগত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরই অন্য নাম।

যাই হোক এ লেখা শেষ করি ভারতীয় বিপ্লবের অন্যতম এক ধারা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসীদের কথা বলে, ফাঁসির আগে নিজের মাকে লেখা চিঠিতে বিপ্লবী আসফাক উল্লা বলছেন, কনডেম সেলের জানালা দিয়ে তাঁর ভোর দেখতে ভাললাগা ও পাখীর ডাক শোনার কথা ও কাহিনীর কথা। সুতরাং ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম আসলে এক আলোরই গল্পমালা। ■

তিন সত্য

জালাল উদ্দিন লস্কর শাহীন (বাংলাদেশ)

মৃত মাছেরা যেমন অপলক
চেয়ে থাকে জ্যোতিহীন--
আমার দুচোখও এখন তেমন
কোনো কিছুতেই কোনো কিছু দেখেনা।
দেখার শক্তি রহিত হয়েছে বহু আগে
তাই এখন আর মনের বিকার নেই
নেই প্রতিক্রিয়া জানানোর ঝামেলা।
বেশ আছি ঝক্কি ঝামেলা ছাড়া।

দেখতে চাইলেই বিপদ,
ঝামেলার মস্ত পাহাড় উড়ে এসে জুড়ে বসে
মনে, মগজে, চিন্তায় ও চেতনায়।
কোনো লাভ নেই দেখে।
যারা দেখতে জানে না
কিংবা ছেড়ে দিয়েছে দেখার ভোগান্তি,
তারা বেশ ভালো আছে।

এর চেয়ে সেই ঢের ভালো,
তবলচীর মতো তবলায় ঝংকার তুলে

উপলব্ধি

সেই ঝংকারের সাথে তাল মিলিয়ে দোল,
দুলতে থাকো, দুলতে থাকো,
ঝুল, ঝুলতে থাকো।

এতো কিছু দেখার কী-ইবা দরকার!
মৃত মৎস্যদের ফলোয়ার হও...
মৃত মাছেরা যেভাবে চারপাশটা পরখ করে
সেভাবেই দেখতে শেখো।
নির্ঝঞ্ঝাট সে দেখাকে
আরো প্রাণবন্ত করতে পারো
কান দুটোকে বধিরের মর্যাদা দিয়ে।

দেখবে না তবে শুনবে কেন?
শোনাও বন্ধ করে দাও। শুনে লাভ কী?
নিতান্ত অপারগ হয়ে যদি শুনতেই হয়-
আরামদায়ক, মজাদার, মুখরোচক কিছু শুনো।
শুনার সাথে আরামের কাজটাও হয়ে গেলো।

আর লাগাম পরিয়ে দাও জবানে।
স্পিচ ইজ গ্রেট,সাইলেন্স ইজ গ্রেটার।
যে নীরব থাকলো সে মুক্তি পেলো এই তত্বটাও মন্দ নয়।
সুতরাং বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে
মিতবাক হওয়ার সুযোগ কেন নষ্ট করবে তুমি?

উপলব্ধি

অতএব মরা মাছের মতো দেখ
বধিরের মত শোনো, আর
বাকপ্রতিবন্ধির মতো ইশারাতে বলো।
তবে বলো কম। কম। একদম কম।

ভক্তিতে মুক্তি- হৃদয়ে ধারণ কর
এই অমৃত বাণী।
দেখবে জীবনের গল্প হবে
এক নির্ঝঞ্ঝাট কাহিনী।

আর যদি বুক ফাটিয়ে কিছু বলতেই হয়-
তবে মনে মোটেও নেই
এমন কথা গলা বাড়িয়ে বলোগ।
তোমার মনের খবর কে রাখে?
মুখেরটাই দেখে সবাই-
তাই মুখর হও স্তবস্তুতি আর বন্দনায়
কিন্তু মুশকিল একটাই, সবাই এসব পারে না।
যারা পারে, তারা পারে। ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ
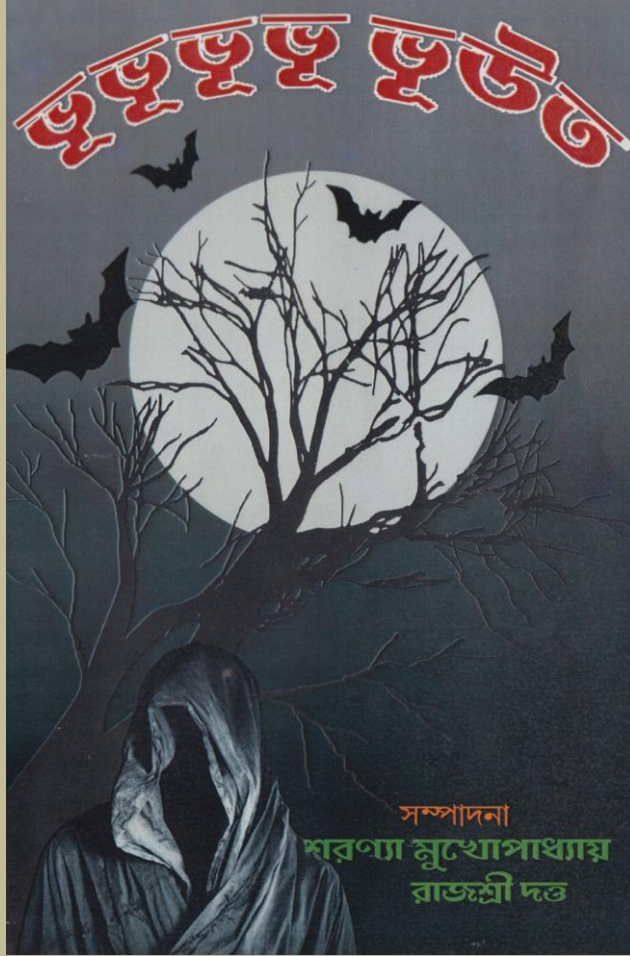
বনমালী তুমি

মালা মুখার্জী

সুজয় অধিকারি নামটা আশেপাশের গাঁয়ে খুবই পরিচিত। ফি বছর যাত্রাপালার বায়না সুজয়ের দলই সবচেয়ে বেশী পায়। কিন্তু এবছর কপাল মন্দ। মহামারীর বাজার, বায়না নেই।

মিনতি ভাত চড়িয়েছে, রেশনের চাল ফুটছে। ঘরের দাওয়ায় বসে নন্দু বই নিয়ে দুলছে, কি যে পড়ছে কে জানে! ইস্কুলেই ঠিকমতো পড়ে না তো আবার বাড়ীতে কি পড়বে? মিনু পুতুলকে ফ্রক পড়াচ্ছে।

“তুমি পঞ্চায়েতে গেসলা? জব-কেরাড কবে পাবে?” মিনতির কথায় দীর্ঘ্যশ্বাস ফেলল সুজয়, “সে মিলব খন,” মিনতি খুশী হলো না, বললও না কিছু। সুজয় হলো গে শিল্পী লোক, ওর গানের সুরে যেন আকাশ বাতাস নেচে ওঠে। এ সেদিনও কে যেন কয়েছিল ওকে কলকেতা নিয়ে যাবে, শো করাবে। এখন নাকি সব বন্ধ। চাষের জমিটুকুও যদি থাকত!

মিনতির চিন্তাজাল ছিন্ন হয়, কপিল মাষ্টার এসেছে, আজও আগডুম বাগডুম কথা বলে দুটো আলু-পেঁয়াজ নিয়ে যাবে। মাষ্টার বিয়ে করেনি, আত্মভোলা মানুষ। মিনতির কেমন যেন মায়া লাগে, ওর নিজের দেওর-ননদ নেই কিনা! মাষ্টার ওকে বৌদি ডাকে। সবাই বলে সুজয় আর মাষ্টার হরিহর আত্মা।

সহোদর

এদিকে সুজয় দাওয়ায় বসে গান ধরেছে। কপিল মাষ্টার সমঝদারের মতো শুনছে, সুজয় জল বাতাসার ফরমাস করেছে, চা থাকলে ভালো। "আমার হয়েছে যত জ্বালা," মিনতি বিড়বিড় করল।

সুজয় আদুর গায়ে শার্ট চড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, "আমি বেলাক অফিসে যাচ্ছি মাষ্টারের সাথে, জব-কেরাড আনতে।" সুজয় বেরিয়ে গেল। মিনতির চোখে জল, উনুনের ধোঁয়ায়। লোকটা অতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়! সুজয় ঘন্টা দুতিন বাদে ফিরে এলো, "জানো, রাস্তা সারানোর কাজটা পেয়ে গেছি।"

মিনতি হাসি মুখে ভাত, ডাল বেড়ে দিল, সঙ্গে গেঁড়িগুগলির তরকারি। নন্দু হাততালি দিয়ে উঠল, "কি মজা, এবার এস্মার্ট ফোন পাবো..."

"এস্মার্ট ফোন কি হবে?" মিনতি ছেলেকে বকল, "খালি বড়নোকি।" "ও ফোনে ইস্কুল হয় গো, নন্দুর মা," সুজয় হাসে।

"বাবা, আমিও ইস্কুল যাবো," মিনু ভাত মাখতে মাখতে বলে উঠল। মিনতি মৃদু ধমক দিল। সুজয় মিনতিকে বলতে লাগল মাষ্টার ফরম ফিলাপ করে দিল বলেই কাজটা পেল। মিনতি দীর্ঘ্যশ্বাস ছাড়ল, "হ্যাঁগো, তোমার কষ্ট হচ্ছে না? তুমি না পালা গাও?" "আরে, আগে তো তোদের পেট ভরাই।"

রাস্তা তৈরির কাজ পেতে দেরি হলো না, বর্ষার আগেই শেষ করতে হবে। ঝপাঝপ মাটি উঠছে। শুধু সুজয় নয়, কপিল-মাষ্টারও আছে, ইস্কুল বন্ধ, ওর মাইনেও। মাষ্টার মাটি কাটে আর বলে ভারী বৃষ্টি হলে নাকি বাঁধ ভাঙ্গবে, ওটারও সারাইয়ের

দরকার। লোকে হাসে, অফিসারবাবুরা শুনতে পান না। শহরে যাবার রাস্তাটা বেশী দরকারি বোধহয়!

একখানা পুরানো এস্মার্ট ফোন সুজয় যোগাড় করল, মাসে মাসে কিস্তিতে শোধ দিতে হবে, মাছের আড়তদার বিমলকে। মাটি কাটার পয়সা এখনও আসেনি, বিমলও চাপ দেয়নি। কপিল মাষ্টার বাড়ী গিয়ে এস্মার্ট ফোনের ব্যবহার নন্দু আর নন্দুর বাপকে শিখিয়েছে। মিনতি শিখতে চায়নি, ওর এত সময় কই?

মেয়েটা হাঁ করে থেকেছে, কি সুন্দর রঙিন ফোন, সুজয়ের পুরানো ডাব্বা ফোন থেকে ছোট্ট কার্ডটা বার করে ওতে দিতেই রঙবেরঙের ছবি, লেখা কতকি ফুটে উঠল। মিনু আর নন্দু টানাটানি করতে লাগল। মিনতি মেয়েকে চড় লাগালো, দাদার পড়ার জিনিসে মেয়েমানুষের অত লোভ কিসের?

“জানো, মাষ্টার বলেছে, আমি গান গাইলে সারা জগতের লোক শুনতে পাবে।” সুজয়ের কথায় হাঁ হয়ে থাকে মিনতি। তবে সুজয় আবার গান বাঁধছে, রাধাকৃষ্ণর পালা। কখনো কখনো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, সুজয় গাইছে, “বনমালী তুমি...” মিনতিরে দেখে গান থামায়, “রথের মেলায় গাইবো, বুঝলি...”

“মেলা হইবো?” মিনতির কথায় উদাস কণ্ঠে সুজয় বলে, “ইউটিউবে গাইব।” “সে কোন মেলা?” মিনতি এখনো ওই রঙিন ফোনটাকে ঠিক বুঝতে পারে না। ফোনটা ভারি সন্দেহজনক, কত মেয়েলোকের ছবি দেখাই দেয়। ইউটিউব কি? ওই মেয়েলোকগুলোর পাড়? এবার মাষ্টারের ওপর মিনতির রাগ ধরল, নিজে বাউণ্ডুলে, সুজয়কেও সেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সহোদর

"টাকা কবে দেবে?" সুজয় গান থামায়, "আজই দেবে, সব গুছিয়ে রাখ মিনতি, এবছর ভারি বর্ষা হবে। সাগরের জল ঢুকবে, বাঁধের দশা ভাল নয়, মাষ্টার বলেছে।" "হ্, ভারী গণতকার এলেন," স্বামীকে ফোনের নেশা ধরানো মাষ্টার আজ মিনতির দুচক্ষের বিষ।

সুজয় মিনতির কথায় হো হো করে হাসল, "আরও কি বলে জান? জল না আটকাতে পারলে চাষীর চোখের জল পড়বে, দুটোই নোনা জল..... লোকে বলে মাষ্টার পাগল।"

"হ্, তোমারেও পাগল বানাবে," মিনতি ভাত নামাতে গেল। আজ নাকি অমাবস্যা, তায় সূর্য্যগ্রহণ। দুটো সেদ্ধ ভাতেভাত খেয়ে সুজয় বেরিয়ে গেল, নন্দু আর মিনুকে মোবাইল রাখিয়ে জোর করে খাওয়ানো হল। গেহন লাগলে আর রান্না-খাওয়া নেই।

আকাশে মেঘ জমছে, আলো কমছে। ছেলেটা টিভিতে গেহন দেখছিল, মিনতি ধমকে বন্ধ করলো ভাইবোনে মোবাইল নিয়ে নাড়ছিল, তাও কেড়ে নিল। দু-একটা তুলসীপাতা ফোনের ওপর দিয়ে, ঠাকুরের সামনে দুটো ধুপ জ্বাললো। ঠিক তখনই মনে হলো বাইরে কোথাও বাজ পড়লো, আর কি জোরে বৃষ্টি! মিনতির ঘরের এখান ওখানের ফাটল বেড়েছে। বালতি বসিয়ে জল আটকানোর চেষ্টা। চালের পুঁটলিটা জড়িয়ে আছে প্রাণপণে। মিনু পুতুলটা ধরে আছে আর নন্দু এস্মার্ট ফোনটা, মিনতির হাসি পেল। ছেলেমেয়েগুলো বাবাকে খুঁজছে। বৃষ্টির জোর একটু কমতে মিনতি সাহস করে বেরলো। দুরে যেন কত

লোকের চেঁচামেচি! এ কি, ওরা এদিকেই যে আসছে, মাষ্টারও আছে। "বাঁধ ভাঙছে, বাঁধ ভাঙছে, পালাও..." মাষ্টার মিনতিকে বেরিয়ে আসতে বলল, "উনি কোথায়?" কপিল মাস্টার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "সুজয়দা ফিরে আসছিল, পয়সা নেয়নি। ফেরেনি?" "বন্ধুকে একা ছেড়ে দিলেন?" মাথা নীচু করে থাকে মাষ্টার। মিনতি ফের বলে ওঠে, "আমি যাবো খুঁজতে," মাষ্টার বলে "আর বাচ্চারা? যেভাবে বাঁধের ফাটল বাড়ছে, গ্রাম ভেসে যাবে আজ রাতে। ইস্কুলবাড়ীটা একটু দুরে, তিনতলা চলো, বৌদি..."

"আপনি বাচ্চাদেরকে নে যান," মিনতি বাইরে এল। গ্রামের রাস্তায় জল জমছে, লোকে উল্টো দিকে হাঁটছে, ইস্কুলের দিকে, আর ও চলেছে বাঁধের দিকে। হাতে রাখা চালের বস্তাটা কখন জলে পড়ে গেছে। এক কোমর জলে আর যে হাঁটা যায় না, মানুষটার সাথে কি আর দেখাও হবে না? হঠাৎই একজোড়া বলিষ্ঠ হাত মিনতিকে তুলে নিল, "মরতে চান বৌদি? ঠিক আছে, আমি সুজয়দারে নিয়েই আসবো।"

কপিলমাষ্টার মিনতিকে একরকম জোর করেই স্কুলবাড়ীর দিকে পাঠাল। ভয়ার্ত মানুষগুলো স্কুলবাড়ীতে বসে আছে। মিনতি বাচ্চাদের জড়িয়ে ধরলো, "বাবা কই, মা?" মিনু পুতুলটাকে আঁকড়ে জিজ্ঞেস করে। মিনতি প্রবোধ দেয় মাষ্টার নিয়ে আসবে। কিন্তু, কেউ আসে না। এক সময়ে গেহণ ছাড়ে, রাত নামে। অসহায় মানুষগুলো একে একে ঘুমিয়ে পড়ে। মিনতির চোখে ঘুম নামে না।

সহোদর

ঘুমন্ত নন্দুর ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ইস্কুলের বারান্দায় আসে মিনতি। হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে "বনমালি তুমি..." গানে চমক ভাঙে। না, মানুষটা নয়, আওয়াজটা ওই ফোন থেকে আসছে আর দুটো সবুজ-লাল চাকতি ঘুরছে। সুজয় শিখিয়েছিল এর মানে কেউ কল করছে, সবুজ চাকতি টিপলে কথা হবে। সবুজ চাকতিটায় হাত দিল মিনতি, ফোনটা কানের কাছে এনে বলল, "হেলো," ও প্রান্তে অচেনা পুরুষ কণ্ঠ, থানা থেকে বলছে, বাজ পড়ে সুজয় অধিকারি মারা গেছে, জব কার্ড থেকে নামটা পেয়েছে। আরও একজন জলে ভেসে গেছে, যদি গ্রামের কেউ হয় যেন আইডেন্টিফাই করে যায়...

মিনতির হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল, ও মাটিতে বসে কেঁদে উঠল। একটা ছবি ভেসে উঠল, সুজয় দাওয়ায় বসে গাইছে, মাষ্টার ফোনে গান তুলছে। ফোনটা আবার বাজছে, মানুষটার শেষ গান বাজছে, কলারটিউন নাকি বলে। সুজয়ের গলা বাতাসে মিশে যাচ্ছে। "তুমি আমারি মতন কান্দিও কান্দিও..." মিনতি কেঁদেই চলেছে, সুজয়ের জন্য না মাষ্টারের জন্য তা ও বলতে পারবে না। সব কান্নার জলেই তো লবণ আছে, তাই না? ■

ওরাও ভালোবাসতে জানে

পত্রালিকা বিশ্বাস

মঞ্চে আছে সৃজনী, আর ওর হাতে রাজ্যের নামকরা একজন চিত্রশিল্পী পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন, পুরস্কারটা হাতে নিয়ে সৃজনীকে কিছু বলতে বলা হয়, মাইক্রোফোনটা হাতে ধরে তেমন কিছু বলতে পারেনা সৃজনী, আসলে ও সদ্য ছয় পার করেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও ওর কথা মানে কয়েকটা শব্দ। আর ওই শব্দগুলোকে নিজের মনের মত এদিক ওদিক বসিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে সৃজনী। ও কি বললো না বললো তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই সৃজনীর মা-বাবা — সীমা ও রাতুলের। ওরা দুজনে তখন মঞ্চে পুরস্কার হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সৃজনীকে দেখে আনন্দে চোখের জলে ভাসছে, এক অপ্রত্যাশিত খুশির আলো ছড়িয়ে পড়ছে ওদের চোখে মুখে।

আজকের এই কর্মকাণ্ডের কৃতিত্বটা কিছুটা রাতুলেরও বটে, আর সৃজনী যে তার মত আঁকার হাতটা পেয়েছে এটাই তার কাছে ভীষণ আনন্দের, আজকে দর্শকের আসনে বসে রাতুল অনেকবার সীমাকে বলেছে, “দেখেছো তো, কার মেয়ে দেখতে হবে তো। আর্টিস্ট রাতুল রায়ের মেয়ে বুঝেছো, দেখেছো আমার মত আঁকার হাতটা পেয়েছে কি

বলো? এটা কিন্তু ওর জিনগত।” সীমাও রাতুলের কথায় সায় দেয়, “একদম বাপ কা বেটি যাকে বলে।” তবে ওই জিনগত শব্দটায় কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে যায়। আসলে সৃজনী সীমার পেটে আসার পর থেকেই ওরা প্রত্যেকটা দিন অপেক্ষা করছিলো একটা ছোট্ট অতিথি আসার। যেদিন সৃজনী হলো, সেদিন ওরা সন্তানকে কাছে পাওয়ার আনন্দে যেমন আনন্দিত, তেমন আবার নিজের সন্তানকে এভাবে দেখে ওদের বুক ফেটে যাচ্ছিলো।

একরত্তি সৃজনীর গঠনগত, বা মুখের আদল, চোখ এগুলো সবই জানান দিচ্ছিলো এক অজানা ঝড়ের। তারপর যেটা জানা গেলো সেটা হলো, সৃজনী ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত। এটা একটা জিনগত ব্যাধি, যা নাকি শতকরা পাঁচশো থেকে হাজার জন নবজাতকের মধ্যে একজনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ট্রাইজমী ২১ জিনটি এই জিন বিকলনের প্রধান কারণ। তাই ডাউন সিনড্রোমের নবজাতকদের মধ্যে যেসকল সমস্যা, জটিলতা দেখা যায় তার বেশিরভাগই দেখা যেতে লাগলো সৃজনীর মধ্যে।

রাতুল বা সীমা দুজনের কাছেই এই রোগ নতুন, জিনগত হলেও তারা বাড়ির বা বংশের কাউকেই দেখেনি এই ধরনের সমস্যার সাথে লড়তে, আর ওদের নিজেদের কাছেও এই সমস্যা একদম নতুন। প্রথম বেশ কয়েক মাস নিজেদেরই দুষতে থাকে এই পরিস্থিতির জন্য, তারপর যখন বাড়ির এবং

বাইরের লোকেরা সরাসরি আঙ্গুল তোলে সীমার দিকে তখন আস্তে আস্তে তারা দুজনেই নিজেদের আশপাশে শক্ত দেওয়াল তোলে, ওদের একরকম জেদ চেপে বসে, সৃজনীকেও ওরা মানুষের মত মানুষ করে তুলবেই।

মঞ্চে সৃজনীকে দেখে অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সীমার যেগুলো চেষ্টা করলেও ভোলা যায়না। ওই যেমন একদিন হঠাৎ পিসি শাশুড়ি এক বিয়েবাড়িতে বলেই বসলেন, "সীমা, মেয়েটা এমন কেন হলো বলতো?" পেটে থাকতে গ্রহণ না মানলে শুনেছি এমন হয়। এই তুমি আবার বাচ্চা নষ্ট করার ওষুধ খাওনি তো ওইসময়, তাতেও তো শুনি নাকি ওইরকম বাচ্চা হয়। আবার একদিন পাড়ার এক ভদ্রমহিলা রাস্তার মধ্যেই জিজ্ঞেস করে বসে, "এই সীমা, মেয়ে পেটে থাকতে কিছু নিয়ম মানোনি নাকি গো, এরকম কেন হলো বলতো? আচ্ছা মেয়েটা ঠিকমত হেঁটে চলে বেড়াবে তো, তোমাদের জন্য আমার খুব চিন্তা হয় গো, যখন তোমরা থাকবেনা, মানে কোনো বাবা মা তো চিরকাল থাকে না তাই বলছি, তখন মেয়েটাকে কে দেখবে বলতো। আহারে ওইটুকু দুধের শিশু কি বা বোঝে ও, কি জানি কোন পাপ করেছিলে, তাই হয়তো..."

এসব কথার কোনদিনও কোন উত্তর দেয় না সীমা, আসলে ও ভাবে, এসব কথার কি কোন উত্তর হয়? শিক্ষিত মানুষজন যদি এমন অশিক্ষিতের মত প্রশ্ন করে বসে তার

উত্তর দেওয়ার কি কোনো মানে হয়? আর মানুষ এখন ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ করছে, তাদের ফোনে তো গুগল বলেও একটা বস্তু আছে নাকি, ওখানে ডাউন সিনড্রোম লিখলেই তো হাজার তথ্য পেয়ে যাবে, তাও এইসব কথা বলে সময় নষ্ট কি না করলেই নয়! আসলে এগুলো যে নেহাত সময় নষ্ট না, বরং সীমাকে আঘাত দেওয়ার একটা পন্থা, সেটা এই কয়েক বছরে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সে। মাঝেমাঝেই নিজেই ভাবে, এদের যে কেন এত চিন্তা, আর কেন এত জ্বালা আমার ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে বুঝিনা বাপু, দুধের শিশুটা কারো তো কোন ক্ষতি করেনি। তাও পাড়ার পার্কে সৃজনীকে নিয়ে যাওয়া হয় না সীমার, ঐ যে পাড়ার লোকেরা সৃজনীর নাকটা চ্যাপ্টা, চোখগুলো ছোট বলে কেউ বলে ভুটানী, কেউ বলে চিনা। সৃজনী এসবের কিছুই বোঝে না, কিন্তু সীমার মনে হয়, যদি বোঝে তাহলে তো খুব কষ্ট পাবে মেয়েটা, তাই আর বাইরে সেরকম বেরোনো হয় না ওই স্কুলে যাওয়া ছাড়া। অবশ্য স্কুল বলতে সেই স্পেশাল এডুকেশন স্কুল, যেখানে সৃজনীর মত আরো অনেকে একটু স্নেহ, ভালোবাসা, আদর মিশিয়ে শিক্ষা পেয়ে বড় হচ্ছে, আর শুধু বড় না, কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিতও হচ্ছে জীবনে।

সৃজনীর খুব মজা হয় স্কুলে গেলে, আসলে বেশ কয়েকটা ক্লাসে ওদের ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ থেরাপি, বিভিন্ন মোটর স্কিল এসবের মধ্যে দিয়ে

কর্মক্ষম করে তোলা হয়। সৃজনী বন্ধুদের সাথে মিশে যায়, খেলে, রং শেখে, স্কুল যেন ওর কাছে সব পেয়েছির জগৎ। কিন্তু এই করোনা, আর লকডাউন সৃজনীর এই মজার মুলুকে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল সৃজনী স্নান হয়ে গেলেই স্কুলের ব্যাগটা নিয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, আর কিছু শব্‌দ জোড়া দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দেয় স্কুলে তাকে নিয়ে যেতেই হবে।

স্কুলে অনেকদিন যাওয়া নেই, সৃজনী ক্রমশ চুপ হয়ে যাচ্ছে, কিচ্ছু যেন করার ইচ্ছে নেই, বাড়িতে ওকে জোর করে, বুঝিয়ে, আদর করেও কিচ্ছু শেখানো যাচ্ছেনা। ভীষণ খিটখিটে আর বিরক্ত যেন সবসময়। এমতাবস্থায় রাতুল একদিন তার ছোট্ট আঁকার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায় ওকে, আগে কোনদিন রাতুল নিজেই আসতে দেয়নি সৃজনীকে পাছে সব ছবি, রং নষ্ট করে ফেলে সৃজনী। কিন্তু ঘরটায় ঢুকেই সৃজনী যেন আবার ভীষণ খুশি হয়ে যায়। ওর কল্পনাকে রং দিয়ে একের পর সাদা কাগজে ফুটিয়ে তোলে, তার কোনোটায় লাল সূর্য, সাদা বকেরা বিকেলে বাড়ি ফিরছে, আবার কোনোটায় হাঁস জলে খেলা করছে সঙ্গে পালতোলা নৌকা। রাতুল আর সীমাও সৃজনীর খুশি দেখে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

হঠাৎ একদিন সকালবেলায় সোশ্যাল মিডিয়ার পেজে স্ক্রল করতে করতে সীমাই প্রথম দেখতে পায় একটা

প্রতিযোগীতার বিজ্ঞাপন, সারা রাজ্য জুড়ে হবে এই প্রতিযোগীতা, আর তাতে ছোট থেকে বড় সবাই যোগ দিতে পারে। সীমার কিন্তু প্রথমে রাতুলের নামটাই মাথায় এসছিল, কিন্তু রাতুলই সেদিন বলে শুধু আমি কেন? আমি আর আমার মেয়ে দুজনেই ছবি পাঠাবো এই প্রতিযোগিতায়, কি কেমন হবে? সীমা বেশ অবাক হয়েই বলে, "তাই? হবে গো ছবি দিতে পারবে মেয়েটা? আমি তো ভাবতেই পারছিনা।" রাতুল প্রত্যুত্তরে বলে, "ভাবতে পারছিনা মানে, তোমার মেয়েও সব পারবে সীমা, একটু ভরসা রাখো। শুধু দেখো ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন আমাদের তাতেই খুশি হওয়া উচিৎ, সৃজনীকে আমরা ভালো রাখতে পারবো, ওকে ঠিক পারবো নিজের পায়ে দাঁড় করাতে, আমাদের ঘরে হয়তো এজন্যই ওর আসা।" সীমা রাতুলকে জড়িয়ে ধরে বলে, "ঠিক বলেছ তুমি। সৃজনীকে আমরাই পারবো ভালো রাখতে।"

আর সেদিনই সেই প্রতিযোগিতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাবা আর মেয়ের হাতে আঁকা ছবি। তারপর লকডাউনে সব আবার চুপচাপ, শুধু সৃজনী ওই রঙের নেশায় বুদ হয়ে আছে। আর লকডাউন মিটতেই বাড়িতে এলো চিঠি, ছোটদের আঁকার বিভাগে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছে সৃজনী, আর তাই তাকে পুরস্কার নিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট অনুষ্ঠানে।

এখন মঞ্চ থেকে পুরস্কার হাতে হুইলচেয়ারে নেমে আসছে সৃজনী, একজন স্বেচ্ছাসেবী হুইলচেয়ারটা ধরে সৃজনীকে নিয়ে আসে ওর বাবা মার কাছে। সীমা আর রাতুল দুজনেই সৃজনীকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে, আর তখনও ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। আর সৃজনী মুখের মাস্কটা সরিয়ে হাসছে আপনমনে।

সৃজনীরা যে কাঁদতে জানেনা, ওরা জানে শুধু হাসতে, খুব অল্পতেই ভীষণ খুশিতে আত্মহারা হতে, আর জানে ভালোবাসতে। ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: অগাস্ট সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ

৭ই অগাস্ট, ২০২০

বেদনা ও রক্তের মায়া সঙ্গম

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

ঠিক মনে নেই এখন...
কবে থেকে পুষেছিলাম এক গোপন অসুখ এমন!
বুকের বয়েসী খাঁচায় বেড়ে ওঠা শাশ্বত
বেদনা আর রক্তের মায়া সঙ্গম;
টের পাই, চলে হরদম অজানা ধুকপুক –
রোদভেজা দুপুর কিংবা রাতের মাঝখান।
নিজস্ব মুগ্ধতায় বদলে নেয় কিছু তার
বিবর্তনী সময়; কী জানি কি অনুকম্পায়!
আঁধার ছোঁয়া আধ-খোলা জানলাও নীরবতার শিল্পকলা জানে
বেশ, ধীরে বুঝে নিই তাও।
পরাজিত ক্ষতের দহন তৃষ্ণায়
আমি চাতক পাখি হই...
নির্ভুল এক তাজা ঝিনুক ছোঁবো বলে।
দীর্ঘ প্রশ্বাসের গোপন কারুকাজে
আমার, 'আমি'রে হারাই রোজ,
কার যেন মিহি শাপের অতলে!
নিশ্চুপে চুরি হয়ে যাওয়া অপরিণত এক
চিলতে ভালোবাসা আমার,
ঘুণ হয়ে ঠোকরায় মগজে অবিরত।

আত্মবিলাপ

ঘুমে কিংবা জাগরণে
আমি তাও টের পাই।

পৃথিবীর নিঃসঙ্গতম 'নাইজেল' এর
শূন্যতারে খুব মনে পড়ে ও-বেলায়।
ভুলে থাকার ভাণে আমি তখন
পাশ ফিরে শুই, আর...
রোদের রঙের মতো শাশ্বত
বেদনারে আলতো করে ছুঁই। ■

স্মৃতিচারণ

বিস্মৃত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইন্দ্রাণী ঘোষ

সাবেক কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলে পৌঁছুলে দেখা যাবে, রবীন্দ্র সরণীর অতি ব্যস্ত ঘন জনবসতির মধ্যে দিয়ে আজও ডালহৌসি অভিমুখী ট্রাম ছুটে চলেছে, উত্তর থেকে দক্ষিণে বিবেকানন্দ রোড ছুঁয়ে পায়ে পায়ে দক্ষিণে সামান্য এগুলে ডান দিকে তাকালে দেখা যাবে কাঁচের প্রাসাদোপম, বছর দুই তিন আগে গজিয়ে ওঠা বিগ বাজার... ঠিক তার বিপরীতে রবীন্দ্র সরণীর বাঁদিকে ঢুকে গেছে এক অতীব সংক্ষিপ্ত অপরিসর কানাগলি, অসামান্য এক রাজপুরুষতুল্য ব্যক্তিত্বের নামে। দ্বারকানাথ টেগোর লেন! হাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন, ইনিই প্রিন্স দ্বারকানাথ, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ, যাঁর সময়কাল থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির বিভিন্ন ঘটনা নতুন খাতে বইতে শুরু করে। বাড়ির যশ, খ্যাতি, পরিচিতি – ইত্যাদি সব কিছুই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ঠাকুরবাড়ির ভাগ্যের চাকাটি নতুন উদ্যমে বৈভব ও প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলে।

এই নাতিদীর্ঘ গলিপথটির শেষ প্রান্তে আজও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রক্তবর্ণের সুরম্য এক অট্টালিকা। ঠিকানা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি, ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। মূলত উত্তর

দক্ষিণে যার বিস্তার। মূল বাড়ির পশ্চিমে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে নকশা করা অনন্য স্থাপত্য কীর্তি 'বিচিত্রা' গৃহ। শোনা যায় এক সময় রবীন্দ্রনাথ এই বিচিত্রা বাড়ির ঝুলবারান্দা থেকে পশ্চিম দিকে গঙ্গার বহে যাওয়া দেখতেন। এক সময় এই বাড়ির মহিলারা পালকি চেপে গঙ্গা স্নান করতে যেতেন। পালকীসহ তাঁদের গঙ্গায় চুবিয়ে গঙ্গা স্নান পর্ব সম্পন্ন হতো। আজ আর গঙ্গা নদী জোড়াসাঁকো থেকে দৃশ্যমান নয়, কারন দৃশ্য পথটি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে, উন্নয়ন এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরিকল্পনা বিহীন প্রতিস্পর্ধী কংক্রিটের অসংখ্য বাড়ি। এই ভিড়ে ক্রমে হারিয়ে গেছে একদা জোড়াসাঁকো বাড়ির প্রতিবেশ, পরিবেশ।

স্মৃতির আরশি ক্রমশঃ ঝাপসা হবার সাথে সাথে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে এই বাড়িতে বসবাসকারী অসংখ্য সভ্যদের জীবন ও অবদান।

১৭৮৪ সালে নীলমনি ঠাকুরের হাতে এ বাড়ির গোড়া-পত্তন হলেও, এর প্রকৃত বিস্তার ঊনবিংশ শতকে। শতাব্দী জুড়ে এই বাড়িতে জন্মগ্রহন করেছেন, একদল নারী পুরুষ, যাদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের মতো জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন না করলেও ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণে তাঁদের ভূমিকাও কোনোভাবেই কম ছিলোনা। ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তিকে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে... তিনি মনে করতেন এঁনারা সকলে মিলে

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটটি রচনা করেছিলেন, এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিভাশালী। সেই সময়ের নিরিখে বাংলার সমাজ সংস্কৃতি নতুন ভাবে উদ্দীপিত করার কাজে এঁদের অবদান ছিলো অসামান্য এবং চিরস্মরণীয়।

আজ আমরা এমনি একজন এই বাড়ির সদস্যের কথা আলোচনা করবো। তাঁর নাম সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজ থেকে প্রায় একশো একান্ন বছর আগে এই গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জেষ্ঠ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি ছিলেন পঞ্চম সন্তান। ১৮৮৬ সাল নাগাদ, তিনি কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন ১৮৯০ সালে। ঐ একই বছরে আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম অধ্যক্ষ পদে আসীন হয়েছিলেন তিনি। ১৮৯১ সাল থেকে তাঁর সম্পাদনায়, 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। অবশ্য পত্রিকা প্রকাশনার সিংহভাগ দায়িত্ব সামলাতেন রবীন্দ্রনাথ। ক্রমান্বয়ে তিন বছর তিনি সম্পাদনার গুরু দায়িত্বটি সামলে ছিলেন।

এরপর ১৮৯৪ সালের ২৫ মে, ঢাকা বিক্রমপুরের ব্রাহ্ম নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা চারুবালার সঙ্গে বিবাহ সূত্রে বাঁধা পড়েন সুধীন্দ্রনাথ। এই শুভকর্ম উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথ

রচনা করেছিলেন একটি গান... "বাজিল কাহার বীনা মধুরস্বরে..." গানটির নিচে কবি নিজে লেখেন... 'সুধীর বিবাহদিনে'। পরবর্তী সময়ে, দুই পুত্র ও তিন কন্যার বাবা মা হয়েছিলেন এই দম্পতি। তাঁদের সন্তানেরা ছিলেন, যথাক্রমে, রমা, এনা, সৌম্যেন্দ্রনাথ, স্বরীন্দ্রনাথ ও চিত্রা।
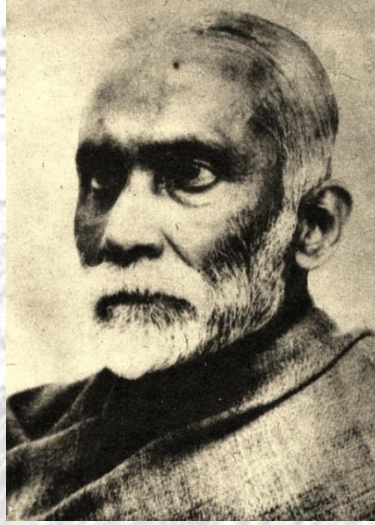
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুধীন্দ্রনাথ ঐ বছরেই বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওকালতি ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন।

ঠাকুরবাড়ির "খামখেয়ালি সভার "একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। বাড়ির ছোটদের নিয়ে তাঁর অনেকটা সময় অতিবাহিত হত। সরলা দেবী তাঁর স্মৃতিচারণে "জীবনের ঝরাপাতা" গ্রন্থে জানিয়েছেন সে কথা – "আমাদের নেতা

ছিলেন সুধিদাদা, বড়মামা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র। তিনি রবিমামার অনুকরণ করে ঠিকই ঠিকই সেই রকম বাল্মীকি সাজতেন, নিজের হাতের লেখাটিও তাঁর লেখার প্রায় অবিকল প্রতিরূপ করে তুলেছিলেন তখন তিনি প্রখ্যাত হননি।" সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার সম্পর্কে লিখেছেন... "পিতার গানের গলা ছিলোনা, কিন্তু খুবই সুরবোধ ছিলো, আর তাঁর বাজনার হাত ছিলো খুবই মিষ্টি। বাড়িতে থিয়েটার এর সময় জ্ঞানের সঙ্গে তিনিই বাজাতেন অর্গান বা পিয়ানো।"

প্রায় আমৃত্যু সাহিত্য সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকতে তাঁকে আমরা দেখি। তাঁর রচিত উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সমন্বিত মোট এগারোটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯২৯ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ ভাইঝি ইন্দিরাকে চিঠিতে লেখেন... "আজ সকালে সুধীর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। আমরা কেউই জানতে পারিনি যে তাঁর সাংঘাতিক পীড়া হয়েছে... তিনদিন আগে খুব হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলো তারপরেই আজ হঠাৎ এই বিপদ..."

প্রায় বিস্মৃত, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্যতম এই সদস্যের আজ জন্মদিন। আসুন সকলে মিলে তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ■

*সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ১৩ জুলাই, ১৮৬৯। কয়েক বছর আগে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ঐ দিনটি পালন উপলক্ষে ইন্দ্রাণী দেবী ওখানে এই লেখাটি পাঠ করেছিলেন।

মৈত্রী-চুক্তি

অনির্বাণ বিশ্বাস

"হ্যাঁরে বিদেশী মানে কি? মেমসাহেব?" সুমনের মা বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন। সুমন হেসে বলল, "না গো মা, মেমসাহেব ঠিক নয়..."

"সে কি পাকিস্তানি নাকি... হে ভগবান আমাকে রক্ষা কর! আমার ছেলের মাথায় সুবুদ্ধি দাও। কি হবে? ও গো আমাদের বুকান শেষে কিনা..." সুমনের মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। সুমনের বাবা স্নান সেরে ঠাকুর প্রণাম করে সুমনের মায়ের পরিত্রাহি চীৎকারে দৌড়ে স্কাইপের সামনে এসে জিজ্ঞাসু মুখ নিয়ে দাঁড়াতে ছেলে বলল, 'বাবা, মাকে বোঝাও পাকিস্তানি নয়, চাইনিজ।'

সুমনের বাবা ও মায়ের মুখ যা বড় হাঁ হয়ে গেল, তাতে একটা বড় মাছি অনায়াসেই ঢুকে যেতে পারত। কিছুক্ষণ সবাই নীরব থাকার পর সুমনের মা বলে উঠল, "যাক বাবা, তাও নিশ্চিন্ত। তা একদিকে ভাল ঘরের টিকটিকি, আরশোলা আর থাকবেনা।"

সুমনের বাবা মুখটা একটু পানসে করে বললেন, "শেষে চীনে বউ! কি করে কথা বলব রে? তা তোরা তো বিদেশে

থাকবি। কিন্তু মানে... ওদের অক্ষরগুলোর মতো... মানে... বিয়েটা কিভাবে করবি? ওরা বুদ্ধিষ্ট, তার মানে তোরা কিছু কি ভেবেছিস্?”

“হবে না, এ বিয়েও আমি মানতে পারবনা।’” সুমনের মা রেগে বললেন। সুমন অনুনয়ের সুরে বলল, “মা, একটু রাজি হয়ে যাও প্লিজ্...ও মোটামুটি এখন বাংলা বলতে পা... আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যাবেলা ট্রেনিং দিচ্ছি। দেখো মা, কাম হিয়ার।”

ওদের সামনে শর্টস আর গেঞ্জি পরা একটা মেয়ে এসে হাতজোড় করে বলল, “নমস্কার, আপনিরা কেমন আছে?” সুমনের বাবা-মা এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর একটু ঢোক গিলে বললেন, “ভাল থাক, কি বলি..মা! একটু থেমে... “তুমি বাংলা বোঝ? আমরা তো তোমাদের চীনে ভাষা জানিনা। কি করে কথা বলি বল তো? কি নাম তোমার?”

“লিও চ্যাং। আপনি ওরিড হবেন না। আমি বাংলা লার্নিং ঠিক শিখে যাব মা আর আমি ভেজিটেরিয়ান। সো নো প্রবলেম। ও তো জানে। আমার জন্য ও তো মাঝে মাঝে ভেজ খায়।” সে হেসে বলল।

সুমনের মা-বাবা দুজনে একটু চোখাচুখি করে বললেন, "মানে তোমরা একসঙ্গে থাক?” সুমন দুম করে ল্যাপটপটা

নিজের দিকে করে বলল, “আরে না, ও মাঝে মাঝে এসে রান্না করে। একসঙ্গে না রে বাবা।”

“হে ভগবান, শেষে এও শুনতে হল! হ্যাঁ রে আর কোনো খবর-টবর নেই তো! হে ভগবান! থাকলে একেবারে বলে দে লোকজন, আত্মীয়-স্বজনকে কি বলব!” সুমনের মা বেশ বিচলিত হয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল।

“দূর না রে বাবা, না। বাবা, মা কি যা-তা বলছে। বিয়ের আগে এসব ছিঃ...” সুমন উড়িয়ে দিল।

হঠাৎ ক্যামেরার সামনে এসে লিও সুমনের মাকে আশ্বস্ত করে বলার চেষ্টা করল, “ডোন্ট ওরি, অ্যাই এগ্রি উয়িথ ইউ। ইয়েস মা, বিয়ের আগে ওসব নয়। আমরা গুড প্রোটেকশন্...।” সুমন লিওর মুখটা চেপে ধরল। হঠাৎ সুমনের বাবা একটা ধপ্ করে আওয়াজ পেলেন। “কি হলো গো তোমার, সরসী। কি গো?” সুমনের বাবা দেখলেন তার স্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছেন। তিনি মুখে জলের ছিটে দিয়ে ডাকতে থাকলেন। “হোয়াট হ্যাপন্ড সুমন? বাবা কি হলো?” লিও কিছু বুঝতে পারছিলো না।

“তোমার জন্য.... মূর্খ কোথাকার। প্রোটেকশন... আমি কোথায় বোঝাচ্ছিলাম।” লিওকে সুমন বকছিল। সুমনের বাবা বললেন, “ওকে বকিস না। ওদের দেশে...যাই হোক তোর মাকে দেখি, পরে কথা বলব। আর একটু মানে... দেখ যা ভালো বুঝিস।”

বলে একবার লিওর দিকে তাকিয়ে ল্যাপটপ বন্ধ করলেন। সুমনও ঢোক গিলে ডিসকানেক্ট হল।

সরসী হঠাৎ জ্ঞান ফিরল, তারপর ধীরে ধীরে তিনি উঠে বসে বললেন, "কি সর্বনাশা কথা শুনলে আমার দুধের ছেলেটাকে কি রকম পাকিয়েছে। কি সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা! বলে কিনা একসঙ্গে থাকে, তাও আবার... ছিঃ ছিঃ..." এই বলে তিনি কানে হাত দিয়ে মাথা নেড়ে কাঁদতে থাকলেন।

"আহাঃ, তুমি এটা দেখলে না মেয়েটা কত সরল। আর ওদের দেশে তো কি বলে ওপেন সেক্স, ফলে ওরা এসব জানবে কি করে? আর দেখ, এখন ওদের জামানা, ওদের লাইফ। আমাদের সময় কি আছে? ওরা সারাজীবন ওখানেই থাকবে, নিজেদের সবকিছু বুঝে নেওয়াই ভাল, না হলে তোমার ঐ বোনের মেয়ের মতো 'হি ইজ নট মাই টাইপ' বলে বেরিয়ে আসবে সেটা ঠিক হবে?" সুমনের বাবা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ব্যস্, একেবারে গরম তেলে ট্যাংরা মাছ জলশুদ্ধ ছাড়লে যা হয়। সরসী একেবারে চিড়বিড়িয়ে উঠে বললেন, "কথায় কথায় আমার বাড়ির প্রসঙ্গ না টানলে আর হবে কেন? আর জগতে কোনো উদাহরণ নেই তো! আর নিজেরা সব কিছু নিজেদের দেখে নেওয়া ভালো বলতে কি বোঝাতে

চাইছ? ছিঃ ছিঃ, বাবা এরকম না হলে এরকম ছেলেপিলে হয়, ছিঃ ছিঃ...”

সুমনের বাবা একেবারে সরসীর ইয়র্ককার্টে ছক্কা। তার কোনো কথাই সরসীদেবী শুনতে রাজি নন। “কি রে কি হয়েছে রে, এতো চেঁচাচ্ছিস কেন?” তারা হঠাৎ দেখলেন সরসীদেবীর বোন কখন দোতলায় এসে ঘরে ঢুকেছেন। সুমনের বাবার একেবারে মনে হলো নো বলে ছক্কা খাবার অবস্থা। মনে মনে চাকরের মুণ্ডপাত করলেও মুখে হাসি টেনে বললেন, “আরে তোমাদের কথাই হচ্ছিল। কি সৌভাগ্য... একটা সুখবর আছে?” “সুখবর! বলুন বলুন জামাইবাবু কি সেটা? তা দিদির মুখটা এরকম কেন?”

“তোমার দিদিকে আর প্রাক্তন এক মুখ্যমন্ত্রীকে হাসতে কম দেখা যায় তো? আরে সুমন বিয়ে করছে, দ্যাটস দ্য নিইজ।” বলে তিনি হাসতে থাকলেন। “ওয়াও, হোয়াট আ গুড নিউজ! কবে ডেট ঠিক করেছে? মেয়ে কি করে, কোথাকার?” সরসীদেবীর বোন খুব এক্সাইটেড... “কি রে! তোর মুখটা ওরকম কেন?” সে তার দিদিকে জিজ্ঞাসা করল।

“মেয়েটা চিনে বুঝেছিস। আর কি কথা! ওরা এখন থেকেই একসঙ্গে, ছিঃ ছিঃ” তিনি মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। সরসীদেবীর বোন এবার তাঁকে বোঝাতে থাকলেন, “আরে ও বিয়ে করবে, ওরা একসঙ্গে থেকে বুঝে নিচ্ছে যে ওরা

একসঙ্গে থাকতে পারবে, এতে সমস্যা কোথায় বল তো? আমাদের মতো সময় কি আছে? এই আমরা রুমলিকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে শিখিয়েছিলাম। অথচ দেখ লোক-লৌকিকতার কথা ভেবে দেখে-শুনে বিয়ে দিলাম। বিয়ের আগে আমার শ্বাশুড়ির কথা মতো দেখা অবধি করতে দিইনি। তাতে কি ফল হলো? দুজনের মানসিকতার বিশাল পার্থক্য থেকে ডিভোর্স পর্যন্ত গেল। দেখ, বর্তমান সমাজে একসঙ্গে থাকতে গেলে দুটি মনের মনের মিল হওয়া, দুজনের অ্যাডজাস্ট করার ক্ষমতা, অনেক ব্যপার থাকে। তাতে লিভ ইনে নিজেরা নিজেদের বুঝে নিতে অনেকটাই পারে। তাই এতে সম্পর্ক টেকে ভালো। কেননা একটা মানুষকে দুঘন্টার জন্য দেখা আর তার সঙ্গে সারাদিন থাকা ডিফারেন্ট ব্যপার। তাই আর তুই আপত্তি করিস না বুঝলি...

"তার মানে তুই বলছিস আমাদের সোশ্যাল ম্যারেজের কোনই গুরুত্ব নেই?" সরসীদেবী বললেন। "একদম না। তবে এটা অনেক সেফ। এট লিস্ট ওরা তো তোকে কোনোদিন ব্লেম করতে পারবে না। রুমলি আমাদের যেমন আজও করে," বলে সে মাথা নীচু করে।

সরসী তার বোনকে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়।

"আর আপত্তি কোরনা সরসী, ওদের জীবনে ওদের স্বাধীনভাবে বাঁচতে দাও। দেখো জীবজন্তুদের। ছোট থেকে বড় করার পর তারা তাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়। আমরা

এতো উন্নত জীব হয়ে আমরা কেন পারব না বলতো? ওদের সুখেই তো আমাদের সুখ, তাইনা বলো!” এই বলে সরসীদেবীর হাতটা ধরলেন সুমনের বাবা।

হঠাৎ সরসীদেবীর বোনের ফোনটা বেজে উঠলো। সরসীদেবী ফোনটা ছোঃ মেরে নিয়ে কি শুনে বললেন। “ও মাসীকে দিয়ে সুপারিশ করা হচ্ছে তাই দেখি হঠাৎ সুমনা এসে উপস্থিত। এবারে বুঝলাম। স্কাইপ ওন করো তো, তুই ও কর।”

স্কাইপে লিও এসে বলল, “মা টুমি এখন ভালো। প্লিজ মা, আমাদের বিয়েটা গ্রান্ট করে ডিও।” লিও মুখের সারল্যে ভরা হাসি দেখে সরসীদেবী হেসে বললেন, “তা তোমাদের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে তো। কি করে বলবে?”

সুমন আর লিও একসঙ্গে হইহই করে উঠল। লিও বলল, "সুমনকে ওর পেরেন্টের খুবই পছন্দ। ওনারাও যোগাযোগ করতে আগ্রহী। আমি ইন্টারপ্রিটারের কাজ করব, ওকে।” তারপর কিছু কথা বলে ওরা বিদায় নিল। সরসীদেবীর মনটা একটু মুষড়ে ছিল। সুমনা ও তার স্বামী সেটা খেয়াল করেছিলেন। চাকর এসে এর মধ্যে চা জলখাবার দিয়ে গেল। সুমনের বাবা এরমধ্যে খবর চালিয়ে দিলেন। “দিদি এতো মন খারাপ করছিস কেন বলত? দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।” সুমনা বলল। “না, শেষে শত্রুদেশ! চীনেরা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সেই

দেশের মেয়ে কিনা আমার ঘরের বউ হবে! এটা মেনে নিতে পারছিনা,” সরসীদেবী বললেন।

“আরে ওরা লণ্ডনে সেটেল্ড। আর সব চাইনিজ লোক কি খারাপ? কেন আমাদের দেশের লোক সব ধোয়া তুলসী পাতা?” এই বলতে বলতে তারা টিভিতে শুনলেন চীনের প্রেসিডেন্ট জিংপিং ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিজীর মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তির সাক্ষর হচ্ছে পুনরায়। সুমনের বাবা হঠাৎ শিশুসুলভ চীৎকার করে বললেন, “গিন্নি আর ভেবনা। দেখ ঐদিকে মৈত্রী-চুক্তিতে স্বাক্ষর হচ্ছে। এদিকে আমরাই পিছিয়ে থাকি কেন? আমরা আমাদের সন্তানের বিবাহের মাধ্যমে দু দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের স্থাপনা করি না কেন!

কাল থেকেই বিয়ের তোড়জোড় শুরু করব। কালই আমরা লিওর মা-বাবার সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তি করব, কি বল সরসী?” এই বলে তিনি হাসতে থাকলেন। “পাগল একটা,” বলে মুখটা বেঁকিয়ে সরসী তার বোনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। ■

প্রতীতির বইপড়া

শামসুদ্দিন শিশির (বাংলাদেশ)

প্রতীতি ২০১৯এ পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা দিল। পরীক্ষা শুরুর আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে পরীক্ষা শেষে কী কী কাজ করবে। ভ্রমণ, বইপড়া এবং শখের ক্যামেরা কেনা। তাই হলো পরীক্ষা শেষে বিখ্যাত দুই লেখক হুমায়ুন আহমেদ এবং জাফর ইকবালের বেশ কয়েকটি বইয়ের তালিকা তৈরি করল সে। সেই তালিকা তার বাবার হাতে দিয়ে বইগুলো কিনতে বলল। বাবা মেয়ের বইয়ের তালিকা নিয়ে বইয়ের দোকানীকে দিলেন। দোকানী তালিকা দেখে এক এক করে বই বের করে দিলেন। প্রথমে জাফর ইকবালের বই। 'দীপু নাম্বার টু', 'বকুল্লাপু', 'বুবুনের বাবা', 'দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর', 'আমেরিকা', 'আধডজন স্কুল।' এরপর হুমায়ূন আহমেদের 'বই নিষাদ', 'পেন্সিলে আঁকা পরী', 'উড়াল পঙখী', 'রূপার পালঙ্ক', 'রজনী, নক্ষত্রের রাত', 'সৌরভ', 'রূপা', 'হুমায়ূন আহমেদ'র হাতে পাঁচটি নীল পদ্ম', 'নির্বাচিত কিশোর উপন্যাস।' প্রতীতির বাবা বইগুলো কিনে বাসায় নিয়ে এলেন। বইগুলো দেখে প্রতীতি মনের আনন্দে নাচতে থাকে। এতো খুশি সে আগে কখনো হয়নি। প্রতিদিন দুই বা তিনটি করে বই পড়ে শেষ করে। আর মা

প্রকৃত বন্ধু

বাবা ও বড় বোনের কাছে বইয়ের গল্পগুলো বলে। সবাই মন দিয়ে বইয়ের গল্পগুলো শুনে। প্রতীতির আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়। ওর বড় বোন তটিনীও আগে যে বইগুলো পড়েনি সে বইগুলো পড়ে শেষ করে ফেলেছে। ২৪ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ১৭টি বই পড়ে শেষ করেছে ওরা।

এবার ভ্রমণের পালা। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ যাত্রা শুরু। গন্তব্য সাজেক বেড়ানো। পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্য স্থান সাজেক। সকাল সাড়ে আটটায় সাজেকের উদ্দেশ্যে রওনা হল ওরা। ভ্রমণ সঙ্গী প্রতীতির মা-বাবা, বোন এবং মামা-মামী ও দুই মামাতো ভাই শাবির, সাদিদ। সাথে গৃহ সহকর্মী ফাহিমা।

চট্টগ্রাম থেকে মাইক্রো নিয়ে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি যেতে সাড়ে তিনঘন্টা সময় লাগে। একদিন খাগড়াছড়িতে থাকতে হয়। অরণ্য বিলাস হোটেলে রাত্রিযাপন। পরদিন সকালে সাজেকের উদ্দেশ্যে রওনা দিল ওরা। নতুন কুঁড়ি স্কুলের শিক্ষক সাইফুল স্যার পূর্বেই তাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করেছেন, আবাসিক হোটেল সাজেক ভ্যালী, আলো ও অধরা। মজার ব্যপার হলো প্রতীতি সাজেক ভ্রমণে যেতেও বই নিতে ভুলেনি। বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে বই খুলে পড়ছে। সাজেকের রাতের দৃশ্য অপূর্ব এক শান্ত সৌম্য পাহাড়ে হেলান দেওয়া আকাশ। কী প্রকৃতি! যতই দেখছে

ততই অভিভূত হচ্ছে ওরা – যে স্রষ্টা পৃথিবীকে আমাদের জন্য এতো সৌন্দর্যমন্ডিত করে তৈরি করেছেন। কোটি কোটি কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি। আনন্দে উদ্বেলিত সবাই। চোখে ঘুম নেই। ভোরে সূর্য ওঠা আর কুয়াশার চাদরে মোড়া অন্য এক সাজেক দেখার অপেক্ষায়। দূরে মেঘালয়, টিম টিম করে আলো জ্বলছে। তা দেখেও মন ভরে গেল।

ভ্রমণ থেকে ফিরে আবারও বই। আবারও হুমায়ূন আহমেদ। এবার কেনা হল 'নির্বাসন', 'মৃন্ময়ী', 'বাঘ বন্দী মিসির আলি', 'হিমু এবং হার্ভার্ড পিএইচডি', 'বল্টু ভাই', 'হিমুর নীল জোছনা', 'মিসির আলির চশমা', নতুন বই পেয়ে ওর মন আনন্দে ভরে ওঠে। এবার বই কিনতে বাবার সাথে সেও যায়। বাসায় বইয়ের ব্যাগ এনে, সে মা আর তটিনীকে দেখায়। মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুরষ্কার সে বাবার কাছ থেকে পেয়ে গেছে। আর কিছু তার চাই না। তবে ৩০ ডিসেম্বর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে। ভালো ফল লাভ করলে আবারও বাবার কাছে বই উপহার চাইবে। এর মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ-এর বইগুলো পড়ে শেষ করার সংকল্প করেছে সে। মনে মনে ভাবছে সে পারবে। কারণ এখন আর ক্লাসের পড়ার তাগিদ নেই।

ক্যামেরাও সংগ্রহ হয়েছে। মায়ের বান্ধবী রুনা আন্টি এবার আমেরিকা থেকে আসতে একটা 'নিকন' ক্যামেরা নিয়ে এসেছেন প্রতীতির জন্য। ওর মা আগেই

প্রকৃত বন্ধু

রুনা আন্টিকে বলে রেখেছিলেন। বিভিন্ন ভাবে ক্যামেরা ব্যবহারের অনুশীলন করছে সে। ভালো ভাবে ব্যবহার করার জন্য দক্ষ কোন আলোকচিত্রীর কাছে শিখতে হবে, বাবা সে ব্যবস্থা করবেন। প্রতীতির সব ইচ্ছেই পূরণ হয়েছে। তবে ঢাকার লালকেল্লা, ওয়ারী বটেশ্বর, বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর দেখার ইচ্ছেটা এখনো অপূর্ণ। আগামী কোনো ছুটিতে সেগুলো দেখার ইচ্ছে রয়ে গেল। ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।
আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com

২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।

৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।

৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

PREVENTION OF COVID - 19
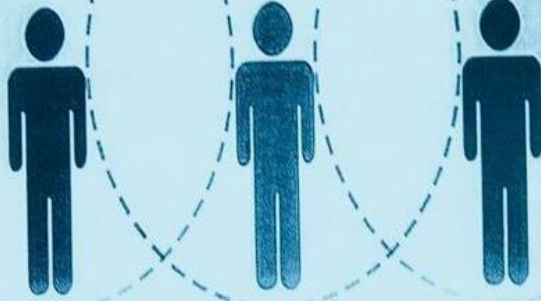
SOCIAL DISTANCING

Photo by Ekaterina Belinskaya from Pexels

PREVENTION OF COVID - 19
Photo by Anna Shvets from Pexels